## হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনই

# একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

সায়্যিদ সুলাইমান নদবী রহ.

**হযরত সায়্যিদ সুলাইমান নদবী রহ. এর অনবদ্য ভাষণ-সমগ্র *খুতুবাতে মাদরাস* -এর বাংলা অনুবাদ *পয়গামে মুহাম্মদী*'র অংশবিশেষ নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন মাওলানা আব্দুল হান্নান।**

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন লক্ষাধিক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যারা পরবর্তীগণের জন্যে তাঁদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন। জীবন-যাত্রার বিভিন্ন ধারা-প্রকৃতির মাধ্যমে প্রত্যেকটি আদম সন্তানকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। কার্থেজের হেবল, ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমের জুলিয়াস সিজার, ইরানের দারা, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান– প্রত্যেকের জীবনেরই একটি আকর্ষণ রয়েছে। সক্রেটিস, পে- টো, এরিস্টটল ও গ্রীসের অন্যান্য জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের জীবনও একটি বিশেষ ধারায় ধাবমান। নমরুদ ও ফেরাউন এবং আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের জীবন-যাত্রায়ও রয়েছে অপর একটি ভিন্ন ধারা। কারূনের জীবন আর একটি পৃথক দৃষ্টান্ত। মোটকথা, দুনিয়ার ক্যানভাসে সহস্র প্রকারের জীবনাদর্শ চিত্রিত হয়েছে। যাদের প্রত্যেকেই আদম সন্তানের হৃদয়রাজ্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও সকল জীবনের অনুসরণীয় আদর্শরূপে গৃহীত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে রেখেছে। কিন্তু এসব বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কার জীবনধারা মানব জাতির কল্যাণ, উন্নতি ও মুক্তিপথের নিশ্চয়তা দানকারী এবং বাস্তব জীবনে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে?

তাঁদের মধ্যে অনেক জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সেনাপতি আছেন, যাঁরা তরবারির আঘাতে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। কিন্তু মানবজাতির মুক্তি, কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্যে তাঁরা কি কোন আদর্শ রেখে গেছেন? তাঁদের তরবারি কি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে মানব সমাজের ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রতিরোধ করতে পেরেছে? আমাদের আধ্যাত্মিক নৈরাশ্য ও হতাশার কোন প্রতিকার তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে কি? তাঁরা আমাদের অন্তরের কলুষতা ও মরচে দূর করতে পেরেছেন কি? আমাদের কর্মপ্রণালী ও নৈতিকতার অবকাঠামো তৈরী করা কি তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে? এর প্রতিউত্তরে পার্থিব জগতের এসব শাহানশাহ বাস্তব জগতে সম্পূর্ণই অকেজো প্রমাণিত হয়েছেন। বিশ্বময় কর্তৃত্ব চালিয়েছেন, বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন, সাময়িকভাবে মানুষের দেহের রাজ্যে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য কিন্তু রূহের জগতে আইন ও শৃঙ্খলা তাঁদের দ্বারা কায়েম হয়নি; বরং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের সকল উপাদান তাঁদেরই দরবার থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাঁরা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কোন কার্যকর নকশা, পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ উপস্থাপন করতে পারেননি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সর্বোচ্চ শ্রেণীর এসব মহান ব্যক্তিবর্গ যাদের জীবনাদর্শ দ্বারা মানব জাতির উপকার ও সংশোধনের আশা করা যেতে পারতো তাঁদের প্রত্যেকের জীবনাবস্থা পরিপূর্ণ ও যথার্থতার সামগ্রিক বিচারে কতোটা অপর্যাপ্ত, অপূর্ণাঙ্গ এবং ব্যর্থ। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টির অনুসন্ধানে দেখা যাবে পৃথিবীর যেখানেই সুকৃতির আলোকরশ্মি ও সততার কিরণ দীপ্তিমানরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, যেখানেই পরিশুদ্ধতা ও ঈমানিয়াতের দৃপ্তশিখা প্রজ্জ্বলিত, সেখানেই তা কেবলমাত্র সেইসব মহামনীষীর জীবনদ্যুতির আলোকরশ্মি ও হিদায়াতের ফলশ্রুতি যাঁদের সঙ্গে আমরা নবী ও রাসূল নামের পরিচয়ে পরিচিত। কুরআনের শিক্ষানুযায়ী "এমন কোন জাতি নেই যার মধ্যে কোন সতর্ককারীর আবির্ভাব ঘটেনি এবং প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছেন এক একজন পথ প্রদর্শক।" প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে আজ কেবলমাত্র তাঁদেরই কথা ও কর্মের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এবং দিকে দিকে তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। নবীগণ পূর্বে আলোচিত সর্বোচ্চ শ্রেণী রাজা-বাদশাহের ন্যায় দেহের উপর নয় বরং হৃদয়ের উপর কর্তৃত্ব চালান। তাঁদের শাসনব্যবস্থা দুনিয়ার রাজ্যে নয় বরং মানবের হৃদয়ের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। যদিও সেনাপতির শানিত তরবারি তাঁদের হাতে নেই তবুও তাঁরা গুনাহর স্তূপ ও অসৎকর্মের সারি মুহূর্তের মধ্যে উল্টিয়ে দেন। তাঁরা কল্পনা রাজ্যে বিচরণকারী কবি দার্শনিক না হলেও আজও মানুষের কান তাঁদের সুমিষ্ট ভাষণের স্বাদ গ্রহণ করছে। তাঁরা যদিও বাহ্যত আইন পরিষদের সিনেটর ছিলেন না তবুও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পরও তাঁদেরই আইন আজও পূর্ববৎ জীবিত আছে এবং তা শাসক ও আদালত উভয়ের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। তাঁদেরই আইন আজও বাদশাহ-ফকীর, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য রয়েছে। এ পবিত্র দলটি আল্লাহর সৃষ্ট লোকালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যুগে যুগে তাঁদের শিক্ষা হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। আজ মানুষের জীবনে কল্যাণ, সৌভাগ্য, নৈতিকতা, সৎকর্ম ও উন্নত জীবনের যা কিছু প্রভাব ও চিহ্ন বর্তমান তার সবকিছু এ মনীষীগণেরই বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গেছেন। দুনিয়ার সচেতন ও বিবেকবান বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী ব্যক্তিবর্গরাই তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সর্বাত্মক চেষ্টা ও বিসর্জনের মাধ্যমে সাফল্যের অনুসন্ধান করছে।

মোটকথা, আমাদের হিদায়াত ও পথনির্দেশের জন্যে আমরা নিষ্কলুষ মানুষ, নিষ্পাপ সত্তা ও সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী ও মনীষীবৃন্দের মুখাপেক্ষী। আর তাঁরা হলেন আল্লাহর নবী। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগে নিজেদের জাতির সামনে সমকালীন অবস্থা অনুসারে উন্নত নৈতিক বৃত্তির ও পূর্ণাঙ্গ

মানবিক গুণাবলীর কোন না কোন কুরবানী পেশ করেছেন। কেউ তাওহীদের আবেগ, কেউ হকের প্রেরণা, কেউ আনুগত্য, কেউ নিষ্কলুষ মনোবৃত্তি, কেউ আল্লাহ-ভীতি প্রভৃতির উন্নত আদর্শ উপস্থাপন করে দুনিয়ার মানুষের জটিল জীবনপথে এক একটি সুউচ্চ মিনার কায়েম করেছেন। যেন তা দেখে মানুষ সোজা ও সরল পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। কিন্তু তবু এমন একজন পথপ্রদর্শক ও নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি নিজের হিদায়াত ও বাস্তব কার্যাবলীর দ্বারা সমগ্র পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি যেন আমাদের হাতে হিদায়াতের একটি পূর্ণাঙ্গ 'গাইড বুক' প্রদান করেন। আর এ গাইড বুকটি নিয়ে প্রত্যেকটি মুসাফির যেন অনায়াসে গন্তব্যস্থানের সন্ধান লাভ করতে পারে। এহেন নেতৃত্বের ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি এ বিশ্বে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াতের সাক্ষ্য দানকারী, সৎকর্মশীলদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দানকারী। আর যারা এখনও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ তাদেরকে সতর্ক ও সাবধানকারী, ভীতি প্রদর্শক, পথভ্রষ্ট লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং তিনি নিজে মূর্তিমান আলোক ও প্রদীপ। এমনি তো সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর বাণীর সাক্ষ্যদানকারী, তৎপ্রতি আহ্বানকারী, সুসংবাদ দানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী প্রভৃতি হিসেবে এ দুনিয়ায় এসেছেন। কিন্তু এসব গুণ তাদের সকলের জীবনে কার্যত সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি। অনেক নবী ছিলেন যারা বিশেষভাবে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইসহাক, হযরত ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম প্রমূখ। অনেক নবীর বিশেষ গুণ ছিল ভীতি প্রদর্শন। যেমন, হযরত নূহ, হযরত মূসা, হযরত হূদ, হযরত শু'আইব আলাইহিমুস সালাম প্রমূখ নবী। আবার অনেক নবীর বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের আওয়াজ দান। যেমন, হযরত ইউসুফ, হযরত ইউনুস প্রমুখ নবী। কিন্তু যিনি একই সঙ্গে সাক্ষ্য দানকারী, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, হকের আহ্বায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং যার জীবনপটে এসব গুণ স্পষ্টভাবে খোদিত ছিল তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তাঁকে দুনিয়ার সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত প্রদান করা হয়েছিল। তাই একে পূর্ণতা দানের জন্য আর কোন নবী আসার প্রয়োজনই রইল না। তার প্রদত্ত শিক্ষা চিরন্তন স্থায়িত্বের অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর জীবনাদর্শই বিশ্ব মানবের জন্য একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ রূপে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। তাই তাঁর সত্তাকে যাবতীয় দিক থেকে পূর্ণতা প্রদান করে অমূল্য অক্ষয় সম্পদে ভূষিত করা হয়েছিল। আর যে চরিত্র বা জীবনাদর্শ মানুষের জন্য একটি আদর্শ জীবনের কাজ করে তাকে গ্রহণ করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। জীবনাদর্শের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা, জীবনাচারের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপকতা এবং ব্যক্তির গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা ও বাস্তবতা।

**জীবনাদর্শের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা**

ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা বা ভিত্তির অর্থ হচ্ছে একজন আদর্শ মানবের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা কিছু পেশ করা হবে তা ইতিহাস ও বর্ণনা পরম্পরার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। কেননা ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত মানব প্রকৃতির উপর যে প্রভাব বিস্তার করে ভিত্তিহীন কাল্পনিক গল্প-কাহিনীর দ্বারা তা কখনো সম্ভব নয়। তাই প্রভাব বিস্তারকারী বাস্তবে কার্যকর ও অনুসরণযোগ্য হবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ঐ পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষটির জীবন চরিত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আমরা সকল নবীকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং তাদের নবুওয়াতের সত্যতায়ও বিশ্বাসী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা "এ নবীগণের মধ্যে অনেককে আমি অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" স্বীকার করি। বস্তুত আদর্শের স্থায়িত্ব, নবুওয়াতের সমাপ্তি এবং সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানবচরিত্র হওয়ার কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন, তা অন্য কোন নবী লাভ করেননি। কারণ অন্য নবীগণকে স্থায়ী, শেষ ও খতমে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করা হয়নি। তাঁদের জীবনচরিতের উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি বিশেষ জাতির নিকট একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত আদর্শ পেশ করা। তাই সে যুগের পর তাঁদের সে আদর্শ ধীরে ধীরে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভেবে দেখুন! প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রত্যেক যুগে কত মানুষ আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছেন। আজ তাঁদের ক'জনের নাম আমরা জানি? হিন্দু সম্প্রদায় দাবী করে যে, তারা দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। যদিও প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। তবুও লক্ষ্য করলে তাদের ধর্মে শত শত মনীষীর নাম পাবেন। কিন্তু এসব মনীষীর একজনের জীবনও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়। ইরানের প্রাচীন পারশী ধর্মের প্রবর্তক যরথুস্ত্র আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও প্রাচীন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে আছে। প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে যারা তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন তারা বহু ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে তার জীবন বৃত্তান্তের কিছু কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাও বিভিন্ন পণ্ডিতের পরস্পর বিরোধী মতের সংঘর্ষে এতই সন্দেহপূর্ণ যে, কোন ব্যক্তি তার উপর নির্ভর করে নিজের কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না।

প্রাচীন এশিয়ার সবচাইতে ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। যা এক সময় ভারতবর্ষ, চীন, সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আজও বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, চীন, জাপান ও তিব্বতে এ ধর্ম বর্তমান আছে এবং সমগ্র দূর প্রাচ্যে তার রাষ্ট্র সভ্যতা ও ধর্ম অস্ত্রবলে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এখনো অজেয় রয়ে গেছে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও কি তারা বুদ্ধের জীবন ও চরিত্রকে ইতিহাসের আলোকে স্থায়িত্ব দান করেছে? এবং কোন ঐতিহাসিক কি ঐ জীবন চরিতের সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দানের ক্ষমতা অর্জন করেছেন? জৈন ধর্মের প্রবর্তকের জীবন বৃত্তান্ত আরো অধিক অনিশ্চিত। অনুরূপ চীনের কনফুসিয়াস সম্পর্কে আমরা বুদ্ধের চেয়েও অনেক কম তথ্য জানি। অথচ তার অনুসারীদের সংখ্যা কোটি কোটি। সেমেটিক জাতির মধ্যে শত শত পয়গম্বর এসেছেন। কিন্তু কেবল নাম ছাড়া ইতিহাসে তাদের আর কোন চিহ্নই নেই। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকূব এবং হযরত ইয়াহইয়ার (আলাইহিমুস সালাম) জীবন ও

চরিত্রের এক একটি বিশেষ অংশ ছাড়া আর কিছুই কি কেউ আমাদের জানাতে পারবে? তাঁদের জীবনের অনেক অংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাদের পবিত্র জীবনের অপলুপ্ত ও অসংলগ্ন অংশ কি কোন পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনের জন্য অনুসরণযোগ্য হতে পারে? কুরআনে মাজীদ বাদ দিলে ইহুদীদের যেসব কিতাবে তাদের জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে তার মধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধরণের সন্দেহ পোষণ করেছেন। এ সন্দিগ্ধ বিষয়গুলো বাদ দিলেও যা অবশিষ্ট থাকে তা তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ চিত্রই আমাদের নিকট পেশ করে।

হযরত মূসা আ. এর অবস্থা আমরা তাওরাত থেকে জানতে পারি। কিন্তু যে তাওরাত আজ আমাদের কাছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীদের অভিমত এই যে, হযরত মূসা আ. এর শত শত বছর পর তা রচিত হয়েছে। এ জন্যই তাওরাতের জীবন কথা ও ঘটনাবলীতে আমরা প্রতি পদে পদে বিপরীতমুখী বর্ণনার সম্মুখীন হই। এ অবস্থায় হযরত মূসা আ. এবং হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মূসা আ. পর্যন্ত সকল নবীর জীবন বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু মজবুত থাকে?

হযরত ঈসা আ. এর জীবনের ঘটনাবলী ইঞ্জিলে লেখা আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে লিখিত অসংখ্য ইঞ্জিলের মধ্যে বর্তমান খ্রিস্টান জগতের বিরাট অংশ মাত্র চারটি ইঞ্জিলকে স্বীকার করে। অবশিষ্ট ইঞ্জিলগুলো(?) নির্ভরযোগ্য নয় বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ঐ চারটি ইঞ্জিলের মধ্যে কোন একটির লেখকও স্বচক্ষে হযরত ঈসা আ. কে দেখেননি। তারা কার মুখ থেকে শুনে এ ঘটনাবলী লিখেছেন এ কথাও জানা যায়নি। বরং যে চার ব্যক্তির সাথে ঐ চারটি কিতাবকে সম্পর্কিত করা হয় তাদের সঙ্গে এ কিতাবগুলোর সম্পর্ক সঠিক কি না এ বিষয়েও বর্তমানে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। ঐ কিতাবগুলো কোন ভাষায় ও কোন যুগে লেখা হয়েছিল তা-ও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়নি। ঈসায়ী ৬৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইঞ্জিল ব্যাখ্যাতা উল্লেখিত কিতাবগুলোর রচনাকাল উল্লেখ করেছেন। তো এ থেকে বুঝা যায় যে, খ্রিস্টানদের বর্ণনা থেকে হযরত ঈসা আ. এর জীবনের যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

কোন মানব চরিত্র একমাত্র তখনই কর্মজীবনের জন্য চিরস্থায়ী আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে যখন তার জীবনী গ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা আমাদের চোখের সামনে থাকে এবং তার জীবনের কোন একটি ঘটনা ও রহস্যও অজানার অন্ধকারে হারিয়ে না যায়। বরং তার সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত ও অবস্থা মানুষের সম্মুখে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট থাকে। এরূপ হলেই উক্ত জীবন মানব সমাজের জন্য একটি আদর্শরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য কি না তা যাচাই করা যেতে পারে।

এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতার জীবন ও চরিত্র যাচাই করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউ এ মানদণ্ডে টিকে না এবং টিকবেও না।

**জীবনাচারের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপকতা**

তাছাড়া হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্যে শুধুমাত্র তিন বা চারজন নবীর জীবন চরিতকে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন জীবন চরিত বাস্তব আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শর্ত জীবনাচারের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপকতা সেটার পূর্ণতার দিক দিয়েও তাঁরা যথেষ্ট নন! চিন্তা করুন, জনসংখ্যার বিচারে দুনিয়ার অধিবাসীদের এক চতুর্থাংশ বুদ্ধের অনুসারী। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক মানদণ্ডের বিচারে বুদ্ধের জীবন মাত্র কিছু কিস্সা-কাহিনীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু আমরা যদি সেগুলোকে ইতিহাসের মর্যাদা দান করে বুদ্ধের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুসন্ধান করি তাহলে সেখানেও আমাদের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে। কেননা সেসব কিসসা-কাহিনী থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, কোন এক যুগে নেপালের রাজপুত্র ছিল গৌতম বুদ্ধ। যিনি স্বভাবত চিন্তাশীল ছিলেন। যৌবনে এক সন্তানের পিতা হবার পর এক সময় কিছু মানুষের দুর্দশা দেখে অত্যাধিক প্রভাবিত হন। স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে রাতের আঁধারে বাড়ী থেকে কাশী এবং পর্যায়ক্রমে পাটনা, বিহার ইত্যাদি এলাকার নগরে, বনে, পাহাড়ে, পর্বতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। তারপর এভাবে কতদিন কাটালেন, কিভাবে গয়ার বৃক্ষতলে সত্যের সন্ধান লাভ করলেন, কতকাল নিজ ধর্ম প্রচার করে বেড়ালেন কত তারিখ ইহজগত থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন তা কিছুই জানা যায়নি। যেমন জানা যায়নি যরথুস্ত্র ধর্মের প্রবর্তক যরথুস্ত্রের জীবন সমগ্র। তো এহেন অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন পূর্ণতার ধারণাও বা কেমন করে করা যেতে পারে এবং তার জীবনই বা কেমন করে মানুষকে পথের সন্ধান দিতে পারে?

অপরদিকে পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত মূসা আ. এর জীবনই সর্বাধিক পরিচিত। বর্তমান তাওরাত নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে পুরোপুরি নির্ভুল মেনে নেয়া সত্ত্বেও তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থ থেকে আমরা হযরত মূসা আ. এর জীবন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানতে পারি?

"হযরত মূসা আ. জন্মগ্রহণ করার পর ফেরাউনের গৃহে লালিত-পালিত হন। বয়স্ক হয়ে ফেরাউনের যুলুমের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলদের সাহায্য করেন। মিসর ছেড়ে মাদায়েন আসেন। পুনরায় মিসর ফিরে ফেরাউনের অগোচরে নিজের জাতিকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। ফেরাউন তার সেনাদলসহ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর তিনি কাফের জাতির সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং একশ বিশ বছর বয়সে কোন এক পাহাড়ে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন! তাঁর এ সুদীর্ঘ জীবনের ক'টি ঘটনাই বা আমরা জানতে পেরেছি? জীবনের প্রয়োজনীয় ক'টি অংশ আমাদের হাতে আছে? অবশ্য তাঁর জন্ম, যৌবনকালে হিজরত, বিবাহ ও নবুওয়াতের কিছু ঘটনাবলী আমরা জানি। তবে এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এ বিষয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। যা জানা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মানব সমাজের বাস্তব আদর্শের জন্য যেসব বিষয়ের প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে চরিত্র, স্বভাব ও জীবন যাপন পদ্ধতি। আর এ অংশগুলোই হযরত মূসার জীবনে অনুপস্থিত।

তেমনিভাবে ইসলামের সর্বাধিক নিকটতম যুগের পয়গম্বর হচ্ছেন খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তক ঈসা আলাইহিস সালাম। ইউরোপীয় হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে তাঁর অনুসারী বিশ্বে সংখ্যাগুরু। কিন্তু বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এ ধর্মের পয়গম্বরের জীবন চরিত অন্যান্য পরিচিত ধর্মসমূহের প্রবর্তক ও পয়গম্বরের জীবন চরিতের তুলনায়

সর্বসাধারণের নিকট সবচেয়ে কম প্রকাশিত। ইঞ্জিলের বর্ণনা মতে হযরত ঈসা আ. তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। বর্তমান ইঞ্জিলসমূহের বর্ণনা প্রথমত অনির্ভরযোগ্য। তারপরও সেখানে কেবলমাত্র তার জীবনের শেষ তিন বছরের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের পর মিশরে আনা হল। শৈশবে দু' একটি অলৌকিক কার্য সম্পাদন করলেন। তারপর আর তাঁর সাক্ষাৎ নেই। অকস্মাৎ ত্রিশ বছর বয়সে তাকে পাহাড় ও নদীর ধারে মৎস্যজীবীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতে দেখা গেল। ইহুদীদের সঙ্গে কিছু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হল। ইহুদীরা তাকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে নিয়ে গেল। সেখানে রোমীয় গভর্ণরের আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। মৃত্যুর তৃতীয় দিন কবরে আর লাশ পাওয়া গেল না। কিন্তু ত্রিশ বছর এবং কমপক্ষে পঁচিশ বছর তিনি কোথায় এবং কিভাবে জীবন যাপন করলেন এর খবর বিশ্ববাসী জানে না এবং কোনদিন জানবেও না। এই শেষ তিন বছরের ঘটনাবলীর মধ্যেও বা কী আছে? কতিপয় অলৌকিক কার্য, বয়ান-বক্তৃতা ও সর্বশেষ মৃত্যুদণ্ড। তো পূর্ণ জীবন ধারার পূর্ণতার মানদণ্ডেও কেবলমাত্র নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বাস্তব চিত্রই পরিপূর্ণ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন। তাছাড়া ব্যাপকতার মানদণ্ডেও শ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

**চরিত্রের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা ও বাস্তবতা**

কোন জীবন চরিতের পক্ষে বাস্তব আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবার জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে তার চরিত্রের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা ও বাস্তবতা। পরিপূর্ণতা ও বাস্তবতার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানব শ্রেণীর পথ নির্দেশ ও আলোক লাভের জন্য যেসব আদর্শের প্রয়োজন অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক রক্ষা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করার জন্য যেসব দৃষ্টান্ত ও নমুনার প্রয়োজন তার সম্পূর্ণই সেই আদর্শ জীবনের ভাণ্ডারে মওজুদ থাকতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউই সেই পূর্ণতায় পূর্ণ হতে পারেননি। আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার নাম ধর্ম। ধর্ম দু' প্রকার। এক প্রকার ধর্মে আল্লাহকে স্বীকার করা হয়নি, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। তাই তাদের প্রবর্তকগণের মধ্যে আল্লাহ প্রেম, আন্তরিকতা, তাওহীদ প্রভৃতির অনুসন্ধানই অর্থহীন। দ্বিতীয় প্রকার ধর্ম আল্লাহকে কোন না কোন পর্যায়ে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এ ধর্মগুলোর প্রবর্তক ও পয়গম্বরগণের জীবনেও আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী অনুপস্থিত। আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসের স্বরূপ কি হওয়া উচিৎ এবং তাঁদের বিশ্বাসের পরিমাণ কি ছিল? উপরন্তু ঐ বিশ্বাসের উপর তাঁরা কতটুকু দৃঢ় ছিলেন? তাঁদের জীবনীতে এ সম্পর্কিত আলোচনা বর্ণিত হয়নি যা সর্বকালে মানব সমাজের জন্য সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ হবে। আল্লাহর তাওহীদ ও তার বিশেষ কিছু নির্দেশাবলী এবং কুরবানীর শর্তসমূহ ছাড়া তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থে এমন একটি বাক্যও নেই যা থেকে জানা যেতে পারে যে, আল্লাহর সঙ্গে হযরত মূসা আ. এর আন্তরিক সম্পর্ক আনুগত্য ও বন্দেগী আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস, পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও আল্লাহর শক্তি বিকাশ তাঁর হৃদয়ে কোন পর্যায়ে ছিল। অথচ মূসার ধর্ম যদি চিরস্থায়ী ও সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে এসে থাকে তাহলে ওসব জরুরী বিষয়গুলো লিখে তাঁর অনুসারীদেরই কর্তব্য ছিল কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না। তাই তারা এ কাজ করতে পারেননি।

হযরত ঈসা আ. এর জীবন বৃত্তান্ত হচ্ছে 'ইঞ্জিল শরীফ'। "আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসার পিতা" এই একটিমাত্র বিষয় ছাড়া এমন আর কিছু পাই না, যার সাহায্যে এ পবিত্র পিতা ও পুত্রের মধ্যস্থিত সম্পর্কের ধরণ স্থির করা যায়। পুত্রের (ঈসার) স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, পিতা (আল্লাহ) পুত্রকে অনেক ভালবাসতেন। কিন্তু পুত্র পিতাকে কি পরিমাণ ভালবাসতেন, আনুগত্য ও নির্দেশ পালনে কতটুকু তৎপর ছিলেন, দিবা-রাত্রের কখন ইবাদতে মগ্ন হতেন? এর কিছুই পাওয়া যায় না এবং পাওয়া সম্ভবও নয়। এমতাবস্থায় এ ধরণের জীবন চরিত থেকে আমরা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কী পরিমাণ লাভবান হতে পারি? বান্দার হকের বিবরণ সম্পর্কেও শেষ নবী ছাড়া আর সকল নবীর জীবনই প্রায় শূণ্য। হযরত মূসা আ. এর জীবনের একটি দিক অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হচ্ছে, যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা। এছাড়া তাঁর আদর্শ অনুসারীদের জন্য পার্থিব অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে তাঁর চরিত্রে কোন পথ নির্দেশ নেই। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তার নীতি কী ছিল, সন্ধি ও চুক্তির দায়িত্ব তিনি কিভাবে সম্পাদন করতেন, তিনি কী ধরণের কল্যাণকর কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, পীড়িত, ইয়াতীম, মুসাফির ও দরিদ্রদের সাথে তার ব্যবহার কিরূপ ছিল? এসব তথ্যের অভাবে হযরত মূসা আ. এর অনুসারীরা তাঁর জীবন চরিত থেকে কী ফায়দা হাসিল করতে পারে? হযরত মূসার স্ত্রী ছিল, ভাই ছিল এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজনও ছিল। আমাদের আকীদা হচ্ছে, তাদের সবার ব্যাপারে তাঁর নবীসুলভ ব্যবহার সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর বর্তমান জীবনী গ্রন্থগুলোতে আমরা এসব বিষয়ে অনুসরণযোগ্য কোন তথ্য খুঁজে পাই না।

হযরত ঈসা আ. এর মা ছিলেন এবং ইঞ্জিলের বর্ণনামতে ভাই-বোনও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের ঘটনাবলী থেকে ঐসব আত্মীয় পরিজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও ব্যবহারের ধরণ প্রকাশ পায় না। অথচ দুনিয়া চিরকাল ঐসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। ধর্মের বৃহত্তর অংশ ঐসব দায়িত্ব পালন করার উপরই নির্ভরশীল। এছাড়া হযরত ঈসা শাসিতের জীবন-যাপন করেছিলেন। তাই তাঁর জীবন চরিত শাসকসুলভ দায়িত্ব পালনের নযীরশূণ্য। তিনি বিয়ে করেননি। অথচ দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেই বিবাহিত এবং সংসার জীবন যাপন করে। তাই দুনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী হযরত ঈসার জীবন থেকে পারিবারিক জীবনের কোন পথ-নির্দেশ পেতে পারে না। যিনি কোনদিন গৃহ-সংসার, পুত্র-পরিজন, ধন-সম্পদ, যুদ্ধ-সন্ধি ও বন্ধু-শত্রুর মধ্যকার সম্পর্কের সাথে কোন সংস্রব রাখেননি, তিনি ঐসব বিষয়ে সমগ্র দুনিয়ার জন্য কিভাবে আদর্শ হতে পারেন? আজ যদি দুনিয়া তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ করে তাহলে কালই সমগ্র দুনিয়ায় কবরের নির্জনতা নেমে আসবে, সমস্ত উন্নতি ও প্রগতির তৎপরতা নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং খ্রিস্টীয় ইউরোপ সম্ভবত এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারবে না।

এ আলোচনা থেকে এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাস্তব কর্মজীবন সর্ব সমক্ষে প্রকাশিত না হলে কোন জীবনকে কখনো "আদর্শ জীবন" ও অনুসরণযোগ্য আখ্যা দেয়া যায় না। কেননা মানুষ উক্ত জীবনে কিসের অনুসরণ করবে? তার কোন কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আমাদের তো যুদ্ধ-সন্ধি, দারিদ্র-ঐশ্বর্য, বিবাহিত-অবিবাহিত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, বান্দার সাথে সম্পর্ক, শাসক-শাসিত, শান্তি-বিপর্যয়, কোলাহল-নির্জনতা তথা জীবনের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। এমন দৃষ্টান্ত যা সমগ্র গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় বাস্তব সম্মত এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী ও বাস্তবায়িত। কিন্তু এ কথা বললে মোটেই বাগ্মিতা বা কবিত্ব করা হবে না যে, এ মানদণ্ডেও একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন জীবন চরিতই টিকবে না। কেননা এ জীবনাদর্শে আপনি একই সঙ্গে খুঁজে পাবেন ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা, জীবনাচারের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপকতা। ব্যক্তির গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা এবং সমাদৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের বাস্তবতা। যাতে অত্যন্ত নির্ভরশীল, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও নিখুঁত, নির্ভুলভাবে মানব সমাজের সকল গোষ্ঠি ও শ্রেণীর বিভিন্ন ধরণের জীবন যাত্রার প্রকাশ ঘটেছে এবং যেখানে সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব ও পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা ও সমর্পিত সর্বোত্তম জীবনাদর্শের প্রতিটি ধারার সর্বাধিক আস্থাশীল চিত্র ফুটে উঠেছে।

আপনি যদি শিশু হোন তাহলে হালীমা সা'দিয়ার আদরের দুলালকে দেখুন, ইয়াতীম হলে আব্দুল্লাহ ও আমেনার কলিজার টুকরা মুহাম্মাদকে দেখুন, যুবক হলে মক্কার উপত্যাকায় আরবী মেষপালকের জীবনী পাঠ করুন। গরীব হলে আবূ তালেবের গিরি সংকটের কয়েদী ও মদীনা প্রবাসীর অবস্থা শ্রবণ করুন। আর ধণী হলে মক্কার ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের অর্থশালীর অনুগামী হয়ে যান। ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী হলে বসরা সফরকারী দলের অধিনায়কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। আপনি যদি স্বামী হোন তাহলে খাদীজা রা. ও আয়েশা রা. এর মহান স্বামীর পবিত্র জীবন অধ্যায়ন করুন। সন্তানের পিতা হলে ফাতেমার পিতা এবং হাসান ও হুসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞেস করুন। আপনি যদি শিক্ষক হোন তাহলে 'সুফফার' শিক্ষালয়ে মহান শিক্ষকের সফলতা অর্জন করুন আর ছাত্র হলে জিবরীলের সম্মুখে উপবেশনকারী আগ্রহী ছাত্রের একাগ্রতা দেখুন। আপনি যদি নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় সত্যের প্রতি আহ্বানকারী হোন তাহলে মক্কার সহায় সম্বলহীন নবীর আদর্শ চিত্র উপলব্ধি করুন। আপনি যদি রাজ্য-জয়ী বিজয়ী বীর হোন তাহলে মক্কা বিজয়ী সিপাহসালারের মহানুভবতা দেখুন। আপনি যদি প্রজা হোন তাহলে কুরাইশ রাজ্যের অনুগত প্রজার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করুন। আর যদি রাজা হোন তাহলে আরব সুলতানের ইতিবৃত্ত পাঠ করুন।

মোটকথা, আপনি যা-ই হোন না কেন এবং যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, আপনার জীবনের জন্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ। যাতে সদা-সর্বদা ইহকালীন সমগ্রজীবনের সমগ্র চিত্রের সর্বজনীনতা ও চিরন্তন পরিপূর্ণতা অন্ধকার গৃহের সমুজ্জল আলোকবর্তীকারূপে রাহনুমায়ী করে। তাই ঈমানী আলোকবর্তীকার অনুসন্ধানরত প্রতিটি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনই হিদায়াতের উৎস ও চির সফলতার একমাত্র মাধ্যম।

দিক-নির্দেশনামূলক নিবন্ধ

# বাতিল প্রতিরোধেও ভারসাম্য থাকতে হবে

মুফতী সাঈদ আহমদ দা.বা.

*এটি ধারণকৃত একটি বক্তব্যের প্রতিলিপি। গত ২২ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে 'নাহী আনিল মুনকার' তথা 'অন্যায় প্রতিরোধে আলেমগণের নীতি ও পন্থা কেমন হওয়া উচিৎ' এ মর্মে বক্তব্যটি প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে এতে আকাবিরদের বরাতে এমন সব দিকনির্দেশনা আলোচিত হয়েছে, যা গোটা আলেম সমাজের জন্য উপকারী হওয়ার আশা করা যায়। এ চিন্তা থেকেই বক্তব্যটি পত্রিকাস্থ করা হল। –সম্পাদক*

দীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আকাবিরগণ আমাদেরকে যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা হল, নিজেদেরকে চমকানোর পরিবর্তে আল্লাহর দীনকে চমকানোর ফিকির করা। দেশের কোন কোন এলাকা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, আল্লাহর দীনের আলো কোথায় কোথায় জ্বালানো যায়, প্রথমে তারা সেটা নির্ধারণ করে নিতেন। এর জন্য তারা বহু কষ্ট-ক্লেশ করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সফর করতেন। আজ যোগাযোগ ও যাতায়াতের কতো সুযোগ সুবিধা। যানবাহন না থাকায় সে সময় যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না। দূর-দূরান্তের সফরে রেলগাড়ী ছিল একমাত্র উপায়। রেলস্টেশনও ছিল সীমিত কিছু এলাকায়। অন্যান্য এলাকায় যেতে হলে কাদামাটির রাস্তায় পায়ে হেঁটে, কখনো গরুর গাড়ী চেপে, কখনো নৌকা ইত্যাদি করে পৌঁছতে হত। আমরা একবার পোরশা মাদরাসায় গেলাম। সেখানকার বর্তমান মুহতামিম সাহেব স্থানীয় এক ধনী পরিবারের সন্তান। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন, পোরশা মাদরাসার অভিভাবক হিসেবে এখনো হাটহাজারীর মুরুব্বিয়ানে কেরাম দায়িত্ব পালন করছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হাটহাজারীর মুরুব্বিগণ এত দূরে এসে অভিভাবকত্ব করছেন আর আপনারাও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলছেন?! সেখানকার উস্তাদ, আমাদের হাটহাজারীর ক'য়েকজন সহপাঠিও মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তারা বললেন, এই পোরশা মাদরাসায় কতবার যে হাটহাজারীর মরহুম মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ সাহেব রহ. এবং মরহুম মুফতী আহমদুল হক সাহেব রহ. আগমন করেছেন তার হিসেব নেই। তখন তো আর এখনকার মতো পিচঢালা মসৃণ সড়ক মহাসড়ক ছিল না। ট্রেনে শুধু রাজশাহী পর্যন্ত আসা যেত। এই আকাবিরগণ সেখান থেকে পোরশা পর্যন্ত গরুর গাড়ী করে আসতেন। এখানে এসেও তারা দিনের পর দিন গরুর গাড়ীতে সফর করতেন। রাস্তার অবস্থা এমন ছিল যে, বর্ষাকালে গরুর গাড়ীর অর্ধেক পর্যন্ত ডেবে যেত। এই মুরুব্বীদ্বয় ছাড়া হযরত নূরুদ্দীন গওহরপুরী রহ.-ও এ এলাকায় বহুবার আগমন করেছেন।

পোরশা মাদরাসা থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে দেশের শেষ সীমানা। পাশেই ভারত সীমান্ত। তার মানে দেশের একেবারেই ঐ প্রান্ত। ভেবে দেখুন, দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে আকাবিরগণ কী বর্ণনাতীত কষ্ট স্বীকার করে সেখানে গিয়েছিলেন। মূলত তারা অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে গোটা দেশের উপর চোখ বুলিয়ে দেখেছেন যে, দেশের কোন এলাকা সবচেয়ে বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন? নির্ণয়ের পর তারা নিজেরা কষ্ট করে আল্লাহর দীনকে চমকানোর জন্য, দীনের বাতি জ্বালানোর জন্য সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। আমাদের রাহমানিয়ার মুরুব্বিগণও সারাদেশ সফর করেন। তবে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাটসহ সীমান্ত এলাকাগুলো সফর করেন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। ছুটি-ছাটা হলে মুফতী সাহেব হুযূর উত্তরবঙ্গে চলে যান দীর্ঘ সফরে। এর উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হল, কোথায় কোথায় অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আছে সেখানে গিয়ে দীনের বাতি জ্বালানো। বাতিল কোন কোন এলাকা গ্রাস করে নিয়েছে সেখানে গিয়ে হকের চেরাগ জ্বালানো।

বর্তমান যুগে বাতিল প্রতিরোধের সবচে' নিরাপদ ও কার্যকর পন্থা হল, বাতিল যেখানে আস্তানা গেড়েছে সেখানে গিয়ে হকের বাতি জ্বালিয়ে দেয়া এবং ইলমে দীনের চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করা। দারুল উলূম করাচীর মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রফী উসমানী সাহেব দা.বা. এ ব্যাপারে আমাদেরকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। একবার এক বুযুর্গ ব্যক্তি তার সাথীদেরকে বাতিল প্রতিরোধের কার্যকর পন্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ব্লাকবোর্ডে একটি আলিফ লিখলেন। লেখার পর সাথীদেরকে বললেন, এই আলিফটা এখন ছোট করতে হবে। কিন্তু শর্ত হল, আলিফের গায়ে হাত দেয়া যাবে না, তাকে স্পর্শ করা যাবে না এবং ডাস্টার বা অন্য কিছু দিয়ে মোছাও যাবে না। শর্ত শুনে তো সবাই হতবাক! গায়ে হাত দেয়া যাবে না, ডাস্টার দিয়ে মোছা যাবে না, আবার ছোটও করে দিতে হবে- এটা কিভাবে সম্ভব? সবাই অপারগতা প্রকাশ করল। কিন্তু সাথীদের একজনের দিলে আল্লাহ তা'আলা এর সমাধান ঢেলে দিলেন। তিনি চক হাতে ব্লাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ঐ আলিফটার পাশে বড় একটা আলিফ লিখে দিলেন। তো ঐ আলিফের গায়ে হাত না দিয়ে তাকে ছোট করে দেয়ার পন্থা হল, তার পাশে আরেকটি বড় আলিফ লিখে দেয়া। এতে আগের আলিফটা ছোট হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যে হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে কাজ করবে তার পন্থা হল, বাতিল যেখানে যে পর্যায়ে আছে সেখানে হককে তার দ্বিগুণ করে দাও। তাহলে বাতিল ছোট হয়ে যাবে। এটা এক হিকমত যে, বাতিলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে হককে ভাল করে চমকাতে হবে।

আমাদের আকাবিরগণ এ যামানায় হককে চমকানোর মূল যে পন্থা আমাদেরকে দিয়েছেন তা হল, قتیر نے ایّی مسیں پر علم کا نقاب ڈال دیا "নিরুপায় তার মিশনের উপর 'ইলম' এর পর্দা ঢেলে দিয়েছে"। অর্থাৎ মিশনকে তার লক্ষ্যে তো পৌঁছাতে হবেই তবে সেটা ইলমী মেহনতের আড়ালে। প্রশ্ন হল, কেন এই 'নেকাবের' ঢাল? আকাবিরগণ দেখেছেন, বাতিলের সাথে বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে কিন্তু মুসলমান যারা হকের সহযোগিতা করবে তারা হয়ে গেছে 'অন্য রকম'।

তাদের এক দলের তো জীবদ্দশায় ইসলামের কোন দরকারই নেই। দরকার শুধু মৃত্যুর পরে। অর্থাৎ কাফনের মধ্যে আতর দিয়ে কালিমা লিখতে হবে, খাটের উপর কালিমা

খচিত চাদর বিছাতে হবে। ব্যস, এটুকুই। আরেক দলের মনোভাব হল, দীন যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সবদিক সামাল দিয়ে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই সই। ঠিক যেন خوش رہے رحمٰن بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی 'আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট থাকুক, শয়তানও নারায না হোক'। অর্থাৎ এরা সুবিধাবাদ পার্টি; মাহফিলেও আছে, গানের পালায়ও আছে। সমাজে এরাই সংখ্যায় বেশি ভারী।

পরবর্তী শ্রেণীটি সংখ্যায় এদের চেয়ে কম তবে দীনদারীতে একটু উপরে। তাদের অবস্থা হল, দীন আমরা মানতে চাই, দীনের জন্য কাজও করতে চাই। কিন্তু যখন কোন ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রয়োজন হবে তখন আমরা اذهب انت وربك ... انا ههنا قاعدون এর দলভুক্ত। অর্থাৎ দুধখোর মজনু, রক্ত দেয়ার নয়। তোমার থেকে সে জ্বালাময়ী বক্তব্য আশা করে কিন্তু নিজে ঐ বক্তব্যে জ্বলে না বা জ্বলতে রাজী না। তারা শুধু শুনতে রাজী আছে। ইমাম সাহেবকে বলবে, হুযূর! এই সময় এমন একটা গরম বক্তব্য না দিলে হয় না! কী সব 'নরমাল' বয়ান করেন, এতে পোষায় না। ইমাম সাহেব জোরালো বক্তৃতা দিলে খুব খুশি। বলবে, আজকের বক্তব্য যুগোপযোগী হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য পরবর্তী প্রোগ্রামে তিনি নেই। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আ. এর জিহাদী আহ্বানের বিপরীতে বলেছিল, "আপনি আর আপনার প্রভু গিয়ে বাতিল জালূতের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, আমরা এখানে বসে থাকব।" আর এখনকার এরা কী বলে? اذهب انت وطلبتك "হুযূর, আপনি আর আপনার ছাত্ররা ময়দানে যান।" وانا ههنا قاعدون ونرى الاخبار والتلفيذيون আর আমরা এখানে বসে বসে টেলিভিশন দেখবো, পত্রিকা পড়বো আর টকশো শুনবো । মৌলভী গোছের কাউকে দেখলে তাদের ইসলাম-দরদ উথলে ওঠে- হায়! ইসলামের কী যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু ত্যাগ-তিতীক্ষার বেলায় উটপাখি। এই হলো জনসাধারণের ফার্স্ট ক্লাস শ্রেণী যাদেরকে নিয়ে আমরা আন্দোলনের স্বপ্ন দেখি।

এই যখন অবস্থা তখন বাতিলের বিরুদ্ধে তুমি কতটুকু করতে পারবে। কতটুকু ঝুঁকি নিতে পারবে। কাজেই এ অবস্থায় তোমাকে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ লক্ষ্য করেছেন, শামেলীর ময়দানেও পরাজয়, রেশমী 'রুমাল আন্দোলন'ও ব্যর্থ। সব জায়গায় শুধু পরাজয় আর পরাজয়। কারণ, মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকে ভরে গেছে। মুসলমান শুধু চেহারা-সূরতে মুসলমান। দুনিয়ার স্বার্থে মুনাফিক হয়ে গেছে। যারা বাকী আছে তারাও নিষ্ক্রিয়। তো এই অবস্থায় সর্বপ্রথম আমাদের মূল মারকাযকে নিরাপদ রাখতে হবে। এজন্য তাঁরা কী করলেন? দারুল উলূম দেওবন্দের গোড়াপত্তন করলেন। বলে দিলেন, فقیر نے اپنی مشن پر علم کا نقاب ڈال دیا "অসহায় এখন নিজের মিশনের উপর ইলমের পর্দা দিয়ে দিচ্ছে"। তো আমাদের সবচে' বড় কাজ হল, মারকাযের হেফাযত করা। ৫ই মে দিবাগত রাতে শাপলা চত্বরের দুর্ঘটনার পর থেকে আমার অন্তরে যে কথাটা বার বার উদিত হচ্ছে তা হল, একটা ব্যাপার যখন ঘটে যায় তখন 'এমন না হলে তো হতো, এটা না হলে তো সারতো' এর কোন যুক্তি থাকে না। কারণ একটা জিনিস ঘটবে বলেই তো পরামর্শ হাতছাড়া হয়ে যায়, দূরদর্শিতা বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং অনভিজ্ঞ লোকের হাতে নেতৃত্ব চলে যায়। এগুলো হল, অ্যাক্সিডেন্টের একটা প্রেক্ষাপট। আল্লাহ তা'আলার মুকাদ্দার (পূর্ব নির্ধারিত) ছিল বলেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনার সাথে আমি হযরত হুসাইন রা. এর কূফা গমনের ঘটনার সাথে অনেক মিল দেখলাম। হযরত হুসাইন রা. মনে করলেন, কূফায় গেলে সেখানকার লোকজন তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে যাবে এবং তিনি ইসলামী খিলাফতের কর্ণধার হয়ে যাবেন। এই আশায় তিনি যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হচ্ছেন তখন দূরদর্শী সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, হযরত আপনি এভাবে যাবেন না, কূফীদের কথায় কোন বিশ্বাস নেই। একান্ত যেতে হলে নারী-শিশুদেরকে সঙ্গে নিবেন না অন্যথায় বিপদ হয়ে যেতে পারে। পরের ঘটনা সকলেরই জানা। তিনি সপরিবারে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং কারবালায় যা ঘটার তা ঘটে গেল। সে এক করুণ ট্রাজেডি, নির্মম ইতিহাস। কিন্তু রাজনৈতিক বিশে- ষণে তখনকার ঐ ঘটনা কোন অবস্থাতেই দূরদর্শিতার মধ্যে পড়ে না। কাজেই বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এটা ঘটাবেন, হুসাইন রা. ও নারী-শিশুদের রক্ত ঝরাবেন এজন্যই তা ঘটেছে। নিশ্চয়ই এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার কোন বিশেষ মাকসাদ আছে।

এখানেও ব্যাপারটা এমনই হয়েছে। আসলে কোন একটা ঘটনা ঘটে গেলে সেখান থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিতে হয়। তাই অতীতের জন্য আফসোস করে লাভ নেই। অতীত থেকে শুধু শিক্ষা নিতে হয়। আমার মনে হল, শামেলীর ময়দানে উলামায়ে কেরামের যে মর্মান্তিক পরাজয়, শাপলা চত্বরের এই দুর্ঘটনাটিও এ রকম। উলামায়ে কেরাম যখন মাঝে মধ্যেই ময়দানের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং মনে করেন যে, এখন আমরা বাতিলের মোকাবেলা সশস্ত্রভাবে কিংবা শক্তি প্রয়োগ করে করতে পারবো, তখন আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দেন যে, এখনো সময় আসেনি এবং এখনকার পরিবেশ এটা নয়; বরং তোমরা তোমাদের মূল কাজ ও মারকায যেন কোন ভাবে আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। তবে এই যে সেখানে এতগুলো লোক চলে গেল আর অদূরদর্শিতার ফলে দুর্ঘটনার শিকার হল, এটা বৃথা নয়। এটা থেকে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন ফল দিবেন। আর তোমাদেরকেও সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, অবস্থা যা-ই হোক মূল মারকাযকে তোমাদের অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। বর্তমান যুগে কিংবা যুগ যুগ ধরে এমন কি শতাব্দীকাল পর্যন্তও হয়তো অবস্থা এমন থাকবে যে, বাতিল মোকাবেলার জন্য ছোট আলিফের বিপরীতে বড় আলিফ লেখার দ্বারা কাজ নিতে হবে। ছোট আলিফের গায়ে হাত দেওয়ার শক্তিও হয়তো আমাদের হবে না। আমাদেরকে ইলমে দীনের মারকায কায়েম করতে হবে। যেখানে বেশি অন্ধকার আছে সেখানেই মাদরাসা কায়েম করতে হবে।

আজ আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমরা নিজেদেরকে চমকানোর চেষ্টা করি। আকাবিররা আমাদেরকে যেটা শিখিয়েছেন তা হল, দীন কোথায় বেশি চমকাবে সেটা আমরা খুঁজে বের করবো। অন্ধকার কোথায় ঘনিভূত হয়েছে সেখানে গিয়ে আলো জ্বালাবো। আকাবিরগণ এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন। আমাদেরকেও সেখান থেকে সবক নিতে হবে। এখন রয়ে গেল, বাতিলের সাথে যখন সংঘর্ষ বেধেই যাবে তখন আমরা কী করব? শুধু মাদরাসা নিয়ে বসে থাকবো আর সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বাতিলের

বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে না? হ্যাঁ, কথা তো বলতেই হবে এবং পদক্ষেপও নিতে হবে, কিন্তু চরমপন্থা থেকে বিরত থাকতে হবে। হুট করেই যেখানে সেখানে বহস-মুনাযারার দাওয়াত দিয়ে দেয়া যাবে না। অনেকে বহসের ডাক দিয়ে তারপর কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে। বলে, হুযূর! অমুক জায়গায় বাতিলের সাথে আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফেলেছি, এখন আপনারা আসেন। আরে কী মুসিবত! এ পর্যন্ত হযরত থানবী রহ. সহ আমাদের যেসব আকাবির মুনাযারার কাজ করেছেন, এক পর্যায়ে গিয়ে তাদের শেষ কথা হলো, এ সমস্ত বহস-মুনাযারা দিয়ে কোন ফায়দা হয় না। এজন্য বাতিল মোকাবেলায় এসবাতী পেহলুতে কাজ করে যাবে। অর্থাৎ হকের আওয়াজকে দ্বিগুণ, তিনগুণ উঁচু করে দিবে। মুনাযারার ডাক দিবে না। কারণ, যাদের সমর্থন নিয়ে কাজ করতে যাবে তাদের উপর কোন আস্থা নেই। তাছাড়া বাতিল আজ চতুর্দিক থেকে শিকড় গেড়ে বসে আছে। দেখা যাবে, ঐ মজলিসে তারা তাৎক্ষণিকভাবে পরাজিত হলেও প্রচার পাবে যে, তারাই বিজয়ী হয়েছে। এটা কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। বহু মুনাযারায় এমন হয়েছে যে, উলামায়ে কেরাম রাতে বাতিলকে পরাস্ত করে সকালে যখন নিজেদের কেন্দ্রে ফিরছেন পথে পোস্টার দেখেন যে, "বাতিল বিজয়ী হয়ে গেছে"। তো লাভ কী হলো? প্রচার মাধ্যম তো তাদের হাতে। আমাদের পক্ষে ওখানে পৌঁছাও সম্ভব নয়। কারণ এতো মিথ্যা বলা উলামায়ে কেরামের পক্ষে অসম্ভব। এজন্য কখনো চরমপন্থায় না যাওয়া; বরং وجادلهم بالتی هی احسن উত্তম পন্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায় চেষ্টাসাধ্য করা এবং সাধারণ জনগণকে যতটুকু পারা যায় এর মধ্যে শরীক করা।

দারুল উলূম দেওবন্দের তারানার একটি পংক্তি হল, ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے (আমরা একই সঙ্গে ফুল ও তরবারী) এটা আল্লামা ইকবালের এক কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি এই পংক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বাণী اشداء على الكفار رحماء بينهم এর তরজমা করেছেন যে, আমরা নিজেদের জন্য ফুল আর অন্যদের জন্য তলোয়ার। হযরত মুফতী শফী রহ. বলতেন, আমার দৃষ্টিতে اشداء على الكفار رحماء بينهم এর সঠিক মর্ম হল, تم ریشم کی طرح بن جاؤ "তোমরা রেশমের মতো হয়ে যাও" এখানে রেশম শব্দটির মধ্যে ফুল ও তরবারী উভয় মর্মই চলে এসেছে। অর্থাৎ রেশম খুবই নরোম ও মোলায়েম জিনিস। স্পর্শ করলে আরাম বোধ হয়। কিন্তু নরোম হওয়ার পাশাপাশি শক্তও খুব; টেনে ছেড়া যায় না। তো তোমরা এরূপ হয়ে যাও যে, যেই ধরবে ,আরাম পাবে। কিন্তু উপড়ে ফেলতে চাইলে তা পারবে না। কেউ তোমাকে তোমার অবস্থান থেকে হটাতে পারবে না। এখন নিজের অবস্থান থেকে সরবে না, বাতিলের সাথে আপোষও করবে না, আবার চরমপন্থীও হবে না– এর জন্য যা দরকার তা হলো, বড়দের সাথে সব সময় মশওয়ারা করে চলা। আকাবিরদের সাথে মশওয়ারা করে যদি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয় তাহলে এটা সহজ হয়।

একবার হযরত মুফতী রফী উসমানী দা.বা. দারুল উলূম করাচীতে ছাত্রদের মজমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা দারুল উলূমে এসে কী পেলে? বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম উত্তর দিল। তিনি মূলত খুবই ইন্তেজামী মানুষ। মানুষ তো মানুষ, আশ-পাশে গাছের ডাল-পালাও আকা-বাঁকা থাকুক তাও তিনি বরদাশ্‌ত করেন না। একটি মাত্র ক্লাস শেষ করে তিনি সারাক্ষণ মাদরাসায় চক্কর দিতে থাকেন যে, কোথাও কোন অব্যবস্থা হচ্ছে কি না? তো একজন ছাত্র বললো, حضرت! ہم نے یہاں آکر اعتدال کو پایا "হযরত! আমরা এখানে এসে সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা পেয়েছি"। তিনি বললেন, ہاں! اعتدال تم نے کہاں تک پایا ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہاں اعتدال سکھایا جائے "হ্যাঁ! মধ্যপন্থা তোমরা কতটুকু পেয়েছো তা জানি না তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, এখানে যারা আসবে তারা যেন মধ্যপন্থী হয়ে যায়"।

হযরত মাওলানা বলতেন যে, আমার আব্বাজান (মুফতী শফী রহ.) নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ইফতার ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলতেন- بھائی جذبات کو طاق کے اوپر رکھنا اگر فقہ میں کام کرنا چاہو تو پھر کیا کرو آج سے جذبات کو طاق میں رکھ دیا "ভাই, আজ থেকে 'অতি উৎসাহ' ভাঁজ করে তাকের উপর উঠিয়ে রাখতে হবে", প্রতিটি কদম চিন্তা-ভাবনা করে উঠাতে হবে। এক সময় পাকিস্তানে শিয়াদের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন শুরু হলো। শ্লোগান উঠলো- کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ کہے وہ بھی کافر "কাফের, কাফের, শিয়ারা কাফের। যে মানবে না সেও কাফের, যে বলবে না সেও কাফের"। কিন্তু দারুল উলূম করাচীওয়ালারা শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে কাফের ফতওয়া দিতে ইতস্তত বোধ করতেন। আর এ ধরণের উগ্র আন্দোলন পছন্দ করতেন না যে, কেউ হামলা করে একজন শিয়া আলেমকে মেরে ফেললো আর সবাই খুব খুশি হয়ে গেল। আবার শিয়ারা প্রতিশোধ স্বরূপ আমাদের একজন বড় হক্কানী আলেমকে মেরে ফেললো। তো এটা কি কোন ভাল কাজ হলো? আফসোস! এ জাতীয় চরমপন্থার কারণে শিয়াদের হাতে কত বড় বড় আলেম শহীদ হয়ে গেছেন। আল্লামা হাবীবুল্লাহ মুখতার সাহেব কত বড় মুহাক্কিক আলেম ছিলেন। *কাশফুন নিকাব* এর লেখক, নিউ টাউনের প্রতাপশালী মুহতামিম। মাত্র ৫২ বছর বয়সেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এছাড়া এ হাঙ্গামায় আরো কত বড় বড় আলেম শহীদ হয়ে গেলেন। এর মোকাবেলায় আবার সুন্নীরা কী বলতেন? তারা বলতেন, আমাদের একজনের মোকাবেলায় আমরা তাদের দশজন মেরে ফেলবো? আরে, তাদের এক'শ জন মারলেই বা কি হল, যেন একশ'টি গরু মারা গেল। পক্ষান্তরে আমাদের বড় একজন আলেম মারা গেলে, চিন্তা করুন এটা কত বড় দুর্ঘটনা, কত বড় ক্ষতি! হক নেওয়াজ জঙ্গী, আজম তারেক সাহেব, জিয়াউর রহমান ফারূকী কত বড় প্রভাবশালী আলেম ছিলেন তারা। যদি সেই চরমপন্থার শিকার না হয়ে আজো বেঁচে থাকতেন তাহলে কত কত কাজ হত!! আমার মনে হয় না, তারা থাকলে আজ পাকিস্তানে শিয়াদের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকতো। মোটকথা দীনের ক্ষেত্রে চরমপন্থা দীনের জন্য সহায়ক হয় না। বলছিলাম, এক সময় শিয়াদেরকে কাফের বলে শ্লোগান দেয়া হচ্ছিল আর দারুল উলূম করাচী কাফের হওয়ার ফতওয়া না দেয়ায় তাদেরকে বলা হত- تم بلی کا گو ہو "তোমরা বিড়ালের বিষ্টা হয়ে গেছো, নিজেদেরকে শুধু লুকিয়ে রাখতে চাও"। কিন্তু পরবর্তী অবস্থা দেখো। আমরা তখন দারুল উলূমের ছাত্র। বেনজীর ভুট্টোর অপশাসনের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরাম একমত হয়ে জোট গঠন করলেন। বাংলাদেশের মতো অবস্থা। ঐক্যজোটের আন্দোলনে স্টেজে হযরত মাওলানা রফী উসমানী সাহেব পাকিস্তানের মুরব্বি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শিয়াদের প্রতিনিধি হাসান তোরাবীও উপস্থিত

ছিল। ইতিপূর্বে শিয়াদের বিরুদ্ধে যারা চরমপন্থী ছিলেন তাদের একজন জনাব আসফান্দ-ইয়ার খান সাহেব তার বক্তৃতায় বলছিলেন, আমাদের মাঝে ইতিপূর্বে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেছে এখন থেকে আমরা একাট্টা হয়ে কাজ করবো। এই বলে তিনি শিয়া নেতা হাসান তোরাবীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সে-ও তার হাত ধরলো। তারপর বললেন, یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے ٹوٹ نہیں سکتا "এই হাত কাটা যেতে পারে তবুও ছুটবে না"। রফী উসমানী সাহেব বলেন এ অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট লাগলো যে, আগে কেন এত বাড়াবাড়ির দরকার ছিল? আর আজ কেন হাত মিলানোর এত প্রয়োজন পড়লো। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তখনকার ঐ বাড়াবাড়িতে ছিলাম না, বর্তমানের এই ছাড়াছাড়িতেও নেই। উলামাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নিজেদের মারকাযকে ঠিক রেখে ই'তিদালের (মধ্যপন্থা) সাথে কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে ইখলাস থাকতে হবে। হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলতেন, حق بات اگر نیت سے حق طریقہ سے کہی جائے تو وہ اثر کرہی رہتی ہے "হক কথা যদি হক নিয়তে হক তরীকায় বলা হয় তাহলে তা প্রভাব ফেলবেই"। তো হক কথা বলতে হবে কিন্তু ইখলাসের সাথে। আর সঠিক পন্থায় বলতে মধ্যপন্থার শর্তে।

সবশেষে আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল, দারুল উলূম করাচীতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব তিরমিযী শরীফের আখেরী দরসে নসীহত করছিলেন (আমরাও উপস্থিত ছিলাম) যে, দেখ ভাই! কর্মক্ষেত্রে গেলে অনেক দিকের হাওয়া, অনেক দিকের ঢেউ তোমাদেরকে আঘাত করবে। সে সময় সোজা থাকার জন্য, স্থির থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে নসীহত করবো, আকাবিরে দীনের সাথে সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি হযরত থানবী রহ. এর মাওয়ায়েয ও মালফূযগুলোও তোমাদের সঙ্গী করে নিবে। আকাবিরদের সাথে তো সব সময় থাকা হবে না, এজন্য মালফূযাতের কথা বলা হল। প্রতিদিন অন্ততঃ একটা করে মালফূয পড়, একটা করে পৃষ্ঠা পড়। তিনি বলেন, দুনিয়ার সব অলি-গলি ঘুরে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, হযরত থানবী রহ. এর মালফূযাত ও মাওয়ায়েয সহীহ রাস্তায় মধ্যমপন্থায় চলার জন্য রাহনুমায়ী করবে।

একবার করাচীতে হযরত হাকীম আখতার সাহেব রহ. এর খানকায় গেলাম। জুমু'আর পূর্বে বয়ানে তিনি বলছিলেন, হযরত থানবী রহ. তার গ্রন্থাবলী রচনার পর বলেছিলেন, উম্মতের আগামী একশত বছরের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। করাচীর হযরত বললেন, এটা তো হযরত থানবী রহ. এর নিজের ধারণা। আসল বাস্তবতা হল কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের রাহনুমায়ীর জন্য হযরতের লিখনী যথেষ্ট।

মোটকথা, ইখলাসের সাথে কাজ করবো নিজেকে চমকানোর নিয়ত না করে দীন চমকানোর নিয়তে। বাতিলের ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবো। পরামর্শ সাপেক্ষে কাজ করবো। আকাবিরদের কারনামা সামনে রাখবো। হযরত থানবী রহ. এর মাওয়ায়েয ও মালফূযাত নিয়মিত মুতালা'আ করবো। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

# সংঘাতময় পরিস্থিতি : উপেক্ষিত নববী আদর্শ

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

দিনে দিনে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। সমতালে এর অধিবাসীরাও 'গরম' হয়ে উঠছে দিনকে দিন। সেই তাপ ও উত্তাপ বিকিরিত হচ্ছে তাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনে। ব্যক্তি কী পরিবার, সমাজ কী রাষ্ট্র-জীবনের সকল অঙ্গনে এর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান। চারদিকে কেবল গরমাগর্মির নির্লজ্জ মহড়া। বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা ও সহনশীলতা আজ অভিধানের শোভা; জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই। অপরকে সম্মান দেয়া, পরমতকে সহ্য করা, জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করা যেন ডুমুরের ফুল; নাম আছে, অস্তিত্ব নেই। খুন-গুম, হত্যা-লুণ্ঠন তো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ; না ঘটলে অবাক লাগে। সৃষ্টিকুলে আজ মানুষের মূল্যই বোধ হয় সবচেয়ে কম। নর্দমায় ভাসছে মানুষের লাশ। ভাগাড়ে মিলছে নরকঙ্কাল। গলিত শবের দুর্গন্ধে বাতাস ভারি। প্রকাশ্যে দিবালোকে উধাও হয়ে যাচ্ছে বনি আদম, বছর গড়িয়েও মিলছে না খবর; না লাশের, না হাড়গোড়ের। এক জগদ্দল পাশবতা চেপে বসেছে সময়ের কাঁধে। গোটা শব্দ-ভাণ্ডারও আদমজাতের হিংস্রতা প্রকাশে অপ্রতুল। অনাচার ব্যভিচারে বাধা পেয়ে পিতা-মাতাকে হত্যা করে যে সন্তান, তাকে ব্যক্ত করে কোন অভিধান! হাত দুয়েক ভূমির দখল নিতে যে ছুরি বসায় ভাইয়ের কলিজায় তাকে প্রকাশ করে কোন শব্দভাণ্ডার! কোন সে ভাষাজ্ঞান ঈমানের দাবীতে বুলেটবিদ্ধ ঝাঁঝরা পাঁজরের অভিশাপ তুলে ধরে! কাকে দোষারোপ করি? অভিযোগের লক্ষ্য তো পর কেউ নয়, একান্ত আপনজন। ইসলামের আলো ও হেদায়েতের নূর-বঞ্চিত লোকদের কথা ভিন্ন। ওরা তো নিজেদের বানরের বংশধর পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু ইসলামের পরিচয়ে পরিচিত আদম সন্তান কীভাবে গোত্র-বংশ ও ভাষা-বর্ণের ভিত্তিতে জান-কবুল হানাহানিতে লিপ্ত হয়। কালিমার গণ্ডিতে একীভূত মুসলমান কিভাবে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নামে খণ্ডিত দণ্ডিত হয়। উম্মাহ আজ নিজেরাই নিজেদেরকে খুবলে খাচ্ছে। উম্মাহর রাহবার ঠিকই বলেছেন, শেষ যুগে আদমের বেটারা খুনোখুনি করে মরবে। হতভাগা জানবে না কেন সে নিহত হলো। আর দুর্ভাগাও বলতে পারবে না কেন সে ভাইয়ের খুনে হাত রাঙ্গালো। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর মূলে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ রয়েছে। যথা-

**ঈমান ও ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতা:** ঈমানের কালিমা হলো لا اله الا الله محمد رسول الله। কালিমা তার অনুসারীদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর একত্র হওয়ার ও জমে থাকার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসী দু'জন মানুষ কখনোই পরস্পরের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হুমকি হতে পারে না। আল্লাহর ভয়, রাসূলের অসন্তুষ্টি এবং পরকালীন জবাবদিহিতা অবশ্যই তার পথ আগলে দাঁড়াবে। ঈমানই তাকে সকল দুষ্কর্মের অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতি বাতলে দিবে। সে বুঝতে পারবে, মুমিন হতে হলে বিবাদ-বিসম্বাদ ও তার বিচারভারসহ পার্থিব জীবনের যাবতীয় কাজকর্মে তাকে কালিমার দাবীর অধীন হতে হবে। তার হাত ও মুখ থেকে তখন জগতের সকল মানুষ লাভ করবে নিরাপত্তা। সে যখন জানবে, দুনিয়ার সকল মুমিন পরস্পরে ভাই ভাই তখন মুমিনের বিপদাপদে সহমর্মিতায় তার মন হু হু করে কেঁদে উঠবে। হামলা, মামলা, গোষ্ঠি উদ্ধার তো অনেক পরের কথা।

**মুমিনের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা:** সংঘর্ষ-সংঘাতের অন্যতম কারণ হল, মুমিনের সত্যিকার মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। মুমিন যদি নিজের ও অপরাপর মুমিনের মর্যাদা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে বহু কলহ-বিবাদ সূচনাতেই মিটে যাবে। মুমিনের মর্যাদা সম্পর্কে নবীজীর ইরশাদ- لاتقوم الساعة على احد يقول الله الله 'আল্লাহকে আল্লাহ স্বীকার করে এমন মানুষ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিয়ামত কায়েম হবে না'। এটা কোন সহজ কথা নয়। শুনেছে কেউ, মালিকের দয়ায় খেয়ে-পরেও যে কারখানার একজন ছাড়া সকল কর্মচারী মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এমন কারখানা কেউ চালু রেখেছে কোনদিন? কিংবা দেখেছে কেউ, একজন মাত্র যাত্রীর জন্য চালু রয়েছে দশ বগির কোন রেলগাড়ী? কিন্তু মুমিনের রব আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড়, প্রতিদিন লক্ষ কোটি ট্রিলিয়ন জ্বালানী ধ্বংসকারী আতিকায় এক সূর্য এবং সূর্যের অনুরূপ অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ও ছায়াপথ বিশিষ্ট মহাকাশ, এসবের ঘূর্ণন এবং দিন-রাতের আবর্তনসহ বিশ্ব জগতের কল্পনাতীত ব্যয়বহুল সকল ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র একজন মুমিনের খাতিরে বহাল রাখবেন। আল্লাহু আকবার! মুমিনের এই মর্যাদা যে হৃদয়ে জাগ্রত থাকে তার পক্ষে কোন মুমিনের ক্ষতি সাধন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

**উম্মাহর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা:** মুসলিম উম্মাহ আর দশটা জাতির মতো নয়। এই উম্মাহর সকল সদস্য এক 'অভিন্ন সত্তা' তুল্য। উম্মাহর প্রতি আসমানী নির্দেশ, তারা যেন আল্লাহর রশি ইসলামকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সকল বিভেদ বিচ্ছেদ পরিহার করে পরস্পরে এক ও অবিচ্ছিন্ন থাকে। নইলে পরিণতি কী হবে তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়– 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে এবং পরস্পরে কলহ করবে না। অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে।' উম্মাহর এ বৈশিষ্ট্য যে কোন মূল্যে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। 'অভিন্ন সত্তা' খণ্ডিত হয় এমন যে কোন কর্মকাণ্ড ও প্রয়াস উম্মাহকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে হয়, চাই তা ব্যক্তি পর্যায়ে যতই ফলপ্রসূ মনে করা হোক। এ বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হওয়ায় উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত। উম্মাহ যেন দস্তরখানে পরিবেশিত লোভনীয় লোকমা যাকে সহজেই উদরে চালান করে দেয়া যায়।

**কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উপেক্ষা:** যে জাতির জীবন বিধানের প্রথম শব্দ হল 'পড়', সে জাতি কীভাবে কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে তা এক বিস্ময় বটে। কুরআন-সুন্নাহর প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলে এবং কুরআন-সুন্নাহর অপরিহার্যতা সম্পর্কে অবগত

থাকলে উম্মাহ জানতে পারতো বিবদমান দু'পক্ষের করণীয় কী আর যারা বিবাদে জড়িত নয় তাদেরই বা করণীয় কী।

**অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ ও অহংকার:** সিংহভাগ সংঘাতের সূত্রপাত আত্মগর্ব ও অহমিকা থেকে সৃষ্ট। পরিণতি যাই হোক অহংকারী তার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসে না। তার অহম তাকে আসতে দেয় না। অহংকারীর অভিধানে ক্ষমা, বিনয় ও নম্রতার স্থান নেই। জনপদ থেকে জনপদ ভস্ম হয়ে যাক তার কোন মাথা ব্যথা নেই। আর অহমিকার সঙ্গে ক্রোধের সংযোগ ঘটলে তো ধ্বংসের ষোলআনা পূর্ণ হয়। 'হামবড়া' অন্যকে তো ক্ষয় করেই নিজেও জ্বলে পুড়ে মরে তবুও নিবৃত হয় না।

**নিজেকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করা:** আত্মগর্বের ভিত্তিতে মানুষ নিজের মত ও সিদ্ধান্তকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করে। অন্যমত বা ভিন্নমত তার কাছে অসহ্য লাগে। নিজের মতও ভুল হতে পারে কিংবা ভিন্নমতও সঠিক হতে পারে এমন ধারণা তার কাছে বিষতুল্য। সে সাথে সিদ্ধান্ত প্রয়োগের দণ্ডটিও যদি তার হাতে থাকে এবং আরেকজন আত্মগর্বী তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তখন সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। অসহায় জনতা তখন উন্মাদ দুই হায়ওয়ানের তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করে এবং বরবাদী তার সকল অনুষঙ্গসহ ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

**নিজেই নিজের মূল্য নির্ধারণ করা:** কেউ যখন নিজেই নিজের মূল্য নির্ধারণ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে ভুলের শিকার হয়। নিজের জন্য সে একটি মূল্য নির্ধারণ করে এবং সবার কাছ থেকে তা উসূল করতে চায়। কোন বিষয়ে পারদর্শী না হয়ে এমনকি কিচ্ছুটি না জেনেও সবখানে সে মাতব্বরী ফলাতে চায়। কিন্তু যে মূল্য পাঁচজনে নির্ধারণ করেনি লোকে তাকে তা দিতে যাবে কেন? এবং দশজনে যাকে মুরুব্বী বানায়নি লোকে তাকে মানতে যাবে কেন? আজকের দিনে সব মহলেই ছড়িয়ে পড়েছে এ প্রাণঘাতী ব্যাধি। এ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব যত বড় পরিসরে দেখা দেয় তার মাশুলও হয় ততো চড়া। জাতীয় পর্যায়ে হলে কথাই নেই; গোটা জাতি সেই সর্বনাশা মুরুব্বিয়ানার খেসারত দিতে থাকে।

**হিংসা-বিদ্বেষ:** মুমিন মাত্রই একথা জানে যে, প্রজ্ঞার আধার আল্লাহ তা'আলাই মানুষের হায়াত-মউত, রিযিক-দৌলত ও ইজ্জত-হাশমতের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি যাকে যে পরিমাণে ইচ্ছা এসব দান করে থাকেন। নিজের জন্য কামনা করা ছাড়া এ নিয়ে কোনরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করাও অন্যায়; হিংসা-বিদ্বেষ তো পরের কথা। বিদ্বেষ পোষণকারী প্রতিপক্ষের ন্যায়ানুগ কাজকর্মেও বিরোধিতা করে। প্রতিপক্ষের ছায়া দেখলেও সে তেড়ে আসে। এতে সে ইনসাফের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়। এটা কোন মুমিনের স্বভাব হতে পারে না। মুমিন তো কাফিরের সাথেও ইনসাফের আচরণ করবে আর ইয়াযিদকেও শোধ করবে প্রাপ্য অধিকার।

**গোষ্ঠি ও দলপূজা:** মানবজীবনে দলবদ্ধতার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে দলবদ্ধতার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। পারস্পরিক উদারতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা মরুভূমিতেও উদ্যান রচনা করতে পারে এবং বরফরাজ্যেও ছোটাতে পারে উষ্ণ প্রস্রবণ। কিন্তু দল যখন 'ভাল হ' না বলে কলহ বিস্তার করে, আন্দোলনের নামে কোন্দল বাধিয়ে দেয়, গলাগলির পরিবর্তে বেছে নেয় গোলাগুলির পথ– দল তখন মল-মূত্রের মতই পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। সত্যের সাথে কুস্তি বাধালেও দলের সাথে দোস্তি রাখতে হবে, শোষণ-পেষণের প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও দলকে পোষণ-তোষণ করে যেতে হবে, দীন-ধর্ম, দেশ-জনতাকে নিলামে ওঠালেও 'তথাস্তু' বলে চেঁচিয়ে উঠতে হবে- এ কেমন বিবেচনাবোধ ও অন্ধপনা মানুষের? একে পূজা-অর্চনা ছাড়া আর কী নামে অভিহিত করা যায়? এ অগ্নিগর্ভ সময়ে দলাদলির ভয়াবহ পরিণতি বোঝাতে উদাহরণ টানার প্রয়োজন নেই; ঘরের কোণে মাথা গুঁজেও তা আঁচ করা যায়।

**সম্পদের মোহ ও পদলিপ্সা:** দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্যতম একটি কারণ সম্পদের মোহ ও পদলিপ্সা। আজ পৃথিবীতে যত বড় বড় সংঘাত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই এ থেকে সৃষ্ট। হাদীসে এসেছে, 'লোভীর উদর কেবল কবরের মাটিই পূর্ণ করতে পারে। সে এক পৃথিবী সম্পদ পেয়েও আরেক পৃথিবীর খোঁজে লেগে যায়।' ধরে মেরে যে পথেই হোক সম্পদ তার চাই-ই চাই। দু' টাকার জন্য সে প্রাণীর কাতারেও নেমে আসতে পারে। স্বার্থের খাতিরে তার পদলেহী হতেও অরুচী নেই। এদিকে পদলিপ্সু কোনদিন ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। ক্ষমতাকে সে মনে করে মৌরুসি সম্পত্তি। সকল মানুষের প্রাণের বিনিময়ে হলেও কুরসীর কাঙ্গাল আপন ক্ষমতা বহাল রাখতে চায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না। সে-ও আরেক পদলিপ্সু বটে! ফলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সীমাহীন নৈরাজ্য। বনি আদমের খুনে পিচ্ছিল হয় পিচঢালা রাজপথ, শহর-নগর-জনপদ। কিন্তু একজন মুমিন জানে, আল্লাহই সার্বভৌমত্বের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। জোর করে ক্ষমতায় থাকা যায় না; যাওয়াও যায় না। তিনি কাউকে ফকিরির আসনেও ইজ্জত দান করেন আবার কাউকে রাজ-আসনেও করেন লাঞ্চিত।

দ্বন্দ্ব-সংঘাতকালিন সর্বত্রই দু'টি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়।

**এক.** সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত দু'দল।

**দুই.** তৃতীয় পক্ষ, যারা সরাসরি সংঘাতে জড়িত নয়।

'জড়িত নয়' এর সঙ্গে 'সরাসরি' বিশেষণ যুক্ত করার কারণ হল, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম উম্মাহর অংশ মনে করে তার জন্য মুসলমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে 'নির্দলীয়', 'নিরপেক্ষ' সেজে নিচেষ্ট থাকার সুযোগ নেই। নির্ণয় করা গেলে সত্য ও ন্যায়কে তার সঙ্গ দিতেই হবে এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিকারে সাধ্যানুপাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্ণয় না করা গেলে তখন সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা-ফিকির করা তার অবশ্য কর্তব্য। কী গজবের কথা! দু'দল মুসলমান লড়াই-ঝগড়া করে ধ্বংস হবে আর সে নিরপেক্ষ সেজে হাত গুটিয়ে থাকবে, সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা বা প্রতিবিধানের চেষ্টা করবে না এমন 'ক্লীব' মুসলমান ইসলামের প্রয়োজন নেই।

সরাসরি লিপ্ত কিংবা সরাসরি লিপ্ত নয় বিবাদ-বিসম্বাদে মীমাংসা পেতে হলে উভয় দলকেই একটি নির্বিকল্প মাপকাঠি অনুসরণ করতে হবে; এমন একটি মাপকাঠি, যা সকল সমস্যার সমাধান পেশ করতে সক্ষম। মুমিনমাত্রই জানে, নববী আদর্শই হলো সে মাপকাঠি। দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুখর এ অস্থির সময়ে এর কোন বিকল্প নেই। 'নববী আদর্শ' শব্দবন্ধ দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের

আদর্শ বোঝানো উদ্দেশ্য। সংঘর্ষ-সংঘাতের কঠিন সময়ে এ মাপকাঠি দ্বারা ব্যক্তি মুমিন ও মুসলিম উম্মাহ নিজেদের দাবী, কর্মপন্থা ও মতাদর্শ মেপে দেখলে এবং সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উম্মাহর জীবনে শান্তি, সাফল্য ও নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত।

কল্যাণযুগের ইমাম, মালিক ইবনে আনাস রহ.-এর কালজয়ী বাণীটি- 'উম্মাহর শেষভাগ কিছুতেই সংশোধিত হবে না যতক্ষণ না তারা প্রথমভাগকে সংশোধনকারী কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করবে' আজ শহর-নগর-বন্দরে, জনপদ ও অলিগলির দেয়ালে দেয়ালে মোটা মোটা লাল হরফে সেঁটে রাখা দরকার, যেন উম্মাহ বিপর্যয়কালীন কর্মপন্থা নির্ধারণে ভুল-ভ্রান্তির শিকার না হয়।

উম্মাহর প্রথম অংশ নিজেদের সকল কর্মকাণ্ড কুরআন-সুন্নাহর নিক্তিতে মেপে দেখতেন। প্রতিটি কাজে-কর্মে নবী ও আসহাবুন নবীর কষ্টি পাথরে নিজেদেরকে পরখ করে নিতেন। কুরআন-সুন্নাহ এবং এ দুটোর রৌশনি ছিল তাদের পথের মশাল, জীবনের আলো। চাইলে আজকের 'গুমরাহা'দেরও এ পথেই খুঁজতে হবে সমাধান।

**সংঘাতকালীন উম্মাহর করণীয়:** সংঘর্ষ-সংঘাতের মৌলিক কারণগুলো উপরে বিবৃত হয়েছে। তার মধ্যে আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো যথা- অহংকার-ক্রোধ, আমিত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, সম্পদ ও পদলিপ্সা ইত্যাদির ইহ-পরকালীন ক্ষয়-ক্ষতি উপলব্ধির জন্য কুরআন-হাদীস থেকে এ সংশি- ষ্ট অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করতে হবে। তারপর হক্কানী পীর-মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামের সাহচর্য গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিক অধ্যাবসায়ের মাধ্যমের সেগুলো দূর করার ফিকির করতে হবে। আর অন্যান্য কারণগুলো দূর করতে দাওয়াত, তাবলীগ ও দাওয়াতুল হকের সাথে সংশি- ষ্ট হয়ে চিল্লা, তিন চিল্লা সময় লাগিয়ে ঈমান-আমল মেরামতের আন্দোলনে জোরদারভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নির্বাচিত কিতাবাদী থেকে লেনদেন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের শরীয়তের বিধি-বিধান জেনে সে অনুযায়ী সকল সৃষ্টিজীবের অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে নিজ অধিকার আদায়ের চেয়ে পরের প্রাপ্য পরিশোধকে অগ্রগণ্য রাখতে হবে। হায়াতুস সাহাবা কিতাব থেকে সাহাবায়ে কেরামের স্বার্থত্যাগ বিষয়ক ঘটনাবলী পড়ে পড়ে ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষার করার অনুশীলন করতে হবে। সর্বোপরি বিভেদ-বিচ্ছেদের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের মাধ্যমে সংযত হয়ে ভাই-ভাই সুলভ সমাজ গঠন করতে হবে।

সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. নিজের মতামত ও দাবী-দাওয়াকে কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামীর সোপর্দ করে দিতে হবে। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহকে বিচারের মানদণ্ড মানতে হবে। লক্ষ্য করুন বিবদমান দু'দলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগর্ত্য কর আল্লাহ, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয় তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ। (সূরা নিসা: ৫৯)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

অর্থ- না (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে। (সূরা নিসা : ৬৫)

এক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশি ও তাগুত-রচিত ভ্রান্ত নির্দেশনা সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ- (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও। (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফয়সালার জন্য তাগুতের (কাফির লিডার) কাছে নিজেদের মুকাদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন সুস্পষ্টভাবে তাগুতকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়। (সূরা নিসা : ৬০)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থ- তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফয়সালা লাভ করতে চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালা দানকারী কে হতে পারে? (সূরা মায়িদা: ৫০)

২. কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামী থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা দ্বীধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। চাই তা যতই অসহ্য ও দুঃসহ মনে হোক না কেন। এক্ষেত্রে পরিবার, দল ও সমাজের তথাকথিত 'স্ট্যাটাস' ও মান-মর্যাদা উপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ- না (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে। তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়। (সূরা নিসা: ৬৫)

**সংঘাতকালীন তৃতীয় পক্ষের করণীয়:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অর্থ- মুমিনদের দু'টি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবৎ না সে আল্লাহর হুকুমের

দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দিও এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। (সূরা হুজুরাত : ৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ- প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, এবং (মীমাংসা কাজে) আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়। (সূরা হুজুরাত : ১০)

নবীজীর ইরশাদ,

عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

অর্থ- হযরত আরফাজা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে কেউই হোক না কেন। (মুসলিম : ২২)

عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا

অর্থ- উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (বিবদমান) মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দেয় এবং এ কাজে প্রয়োজনে কম-বেশি কিছু বলে তাহলে সে মিথ্যাবাদী নয়। (তিরমিযী : ১৯৩৮)

**বিচারক ও মধ্যস্থতাকারীর মৌলিক সতর্কতা:**

**(ক) কুরআন-সুন্নাহ ও এর আলোকে ফয়সালা করা।**

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

অর্থ- এবং (আমি আর্দেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারে বিচার করবে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। (সূরা মায়িদা : ৪৯)

عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو لا أقصر في الإجتهاد فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

অর্থ- হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে (মু'আযকে) জিজ্ঞাসা করলেন, (আচ্ছা বল তো দেখি!) যখন তোমার কাছে কোন মামলা-মুকাদ্দমা পেশ করা হবে, তখন তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে? উত্তরে মু'আয বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। এবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যদি এর কোন সমাধান না মিলে, তখন কি করবে? উত্তরে মু'আয বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (অর্থাৎ হাদীসে রাসূল) অনুযায়ী ফয়সালা করব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, যদি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের মধ্যেও তার সমাধান না পাওয়া যায় তখন কী করবে? উত্তরে মু'আয বললেন, তখন আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতেহাদ করব এবং এই কাজে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করব না। মু'আয (রা.) বলেন, আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই কাজটি করার তৌফিক দান করেছেন যে কাজে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। (আবূ দাউদ : ৩৫৯২)

**(খ) সত্য নির্ধারণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা-ফিকির করা।**

عن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذى في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

অর্থ- হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার হয়ে থাকে, তার মধ্যে এক প্রকারের জন্য জান্নাত এবং দুই প্রকারের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সে বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে যে সত্যটি উপলব্ধি করেছে এবং সে অনুযায়ী বিচার করেছে। আর যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করেও বিচারের মধ্যে অন্যায় (জুলুম) করল, সে বিচারক জাহান্নামী। অনুরূপভাবে সে বিচারকও দোযখে প্রবেশ করবে, যে অজ্ঞতার সাথে মানুষের মধ্যে বিচার করল (এবং ভুল ফয়সালা দিল)। (আবূ দাউদ : ৩৫৭৩)

عن علي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد

অর্থ- হযরত আলী (রা.) বলেন, (যখন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, অথচ আমি একজন যুবক, বিচার বা শাসন সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে অচিরেই সৎপথ প্রদর্শন করবেন এবং তোমার যবানকেও সঠিক রাখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, যখন দুই ব্যক্তি (বাদী ও বিবাদী) কোন ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তখন প্রতিপক্ষের কথাবার্তা না শোনা পর্যন্ত বাদীর পক্ষে (ডিক্রি) রায় প্রদান করো না। কেননা, প্রতিপক্ষের বর্ণনা হতে মুকাদ্দমার রায় প্রদানে তোমার সাহায্য মিলবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর পর) আমি আর কোন মুকাদ্দমায় সন্দেহে পতিত হইনি। (আবূ দাউদ : ৩৫৮২)

**(গ) রাগ-অনুরাগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির উর্ধ্বে থাকা-**

عن أبي بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان

অর্থ- হযরত আবূ বাক্‌রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত

অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা না করে। (বুখারী : ৭১৫৮)

**(ঘ) পক্ষপাত থেকে বেঁচে থাকা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা।** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

অর্থ- হে দাউদ! আমি পৃথিবীতে তোমাকে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুগামী হয়ো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা হিসাব দিবসকে বিস্মৃত হয়েছিল। (সূরা ছোয়াদ : ২৬)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

অর্থ- এবং (আমি আদেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারে বিচার করবে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো; পাছে তারা তোমাকে ফিতনায় ফেলে এমন কোন বিধান থেকে বিচ্যুত করে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তাদের কোন কোন পাপের কারণে তাদেরকে বিপদাপন্ন করার ইচ্ছা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক। (সূরা মায়িদা: ৪৯)

নবীজীর ইরশাদ,

عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل

অর্থ- হযরত মু'আবিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মু'আবিয়া! তোমাকে শাসন-ক্ষমতা দেয়া হলে আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো। (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা : ৭৩৮০)

**(ঙ) আখেরাতের জবাবদিহিতা স্মরণ রাখা।**

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين

অর্থ- হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে মানুষের মধ্যে কাযী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হল। (তিরমিযী : ১৩৪০)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী: ৭১৩৮)

কলহ বিবাদ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতে উপর্যুক্ত দিক নির্দেশনা অনুসরণ করলে আগুনে পানি ঢালার মতই মুহূর্তে নিভে যাবে উম্মাহর যত জ্বালা-যন্ত্রণা। কিন্তু কথা হল, আর কবে আমরা এদিকে মনোযোগী হবো? সময় সুযোগ হাতে থাকতে, নাকি সবকিছু খোয়ানোর পর!? আল্লাহই মানুষের কলব ও হৃদয়ের মালিক। তাঁর কাছেই সকল আবদার-অনুযোগ।

# উলামায়ে কেরাম! দুঃস্থ মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করুন

**মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.**

যাহারা বলে যে, তরবারীর দ্বারা ইসলাম প্রচার হইয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। দুর্ধর্ষ আরববাসীকে তরবারীর দ্বারা করতলগত করা একটি মানুষের পক্ষে, একটি ক্ষুদ্র দলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ আরববাসীরা এত সম্মানবোধ সম্পন্ন এবং এত বীর যোদ্ধা ছিল যে, তাহারা কখনও অন্যের তরবারীর সামনে মাথা নত করার পাত্র ছিল না। ইসলাম প্রচার হইয়াছে ইসলামের সত্যতার বলে এবং হযরত রসূলুল্লাহ হইতে শুরু করিয়া খোলাফায়ে রাশেদীন এবং বুযুর্গানে দ্বীনগণের খেদমত গোজারীর বলে এবং তাঁহাদের নৈতিক চরিত্রের বলে। আজ আমরা খেদমত ছাড়িয়া দিয়াছি, নৈতিক বল আমরা হারাইয়াছি, পূর্ব পুরুষের ইতিহাসও ভুলিয়াছি, খৃষ্টান মিশনারীদের খেদমত গোজারী ও দুঃস্থ মানবতার সেবা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতেছি। আমি আমার মুসলমান ভাইদেরে সাধারণভাবে এবং ওলামা ভাইদেরে খাসভাবে বলিতেছি– আপনারা খেদমত শিখেন, খেদমত করার অভ্যাস করেন, আখলাক-চরিত্র উন্নত করেন, দেখিবেন আপনাদেরও ইজ্জত ফিরিয়া আসিবে এবং যেসব অজ্ঞ ভাইয়েরা সত্য জিনিস না চিনিয়া শুধু উপরের চাকচিক্যে ভুলিয়া খৃষ্টান মিশনারীদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের গুণ-গানে চতুর্মুখ হইয়া আছে তাহাদেরও জ্ঞান উদয় হইবে। তাহারাও ইতিহাস আলোচনা করিয়া নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের মহান চরিত্রে চরিত্রবান হইতে চেষ্টা করিবে, আর তাহাদের মধ্যে হীনমন্যতা বা পরানুকরণ-প্রিয়তা থাকিবে না।

আমাদের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কিভাবে খেদমত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র এদিক দিয়া কত উন্নত ছিল তাহার দুই তিনটি দৃষ্টান্ত সংক্ষিপ্তাকারে আপনাদের সামনে পেশ করিতেছি–

হযরত রসূলুল্লাহ নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে কিভাবে দুঃস্থ মানবতার সেবা করিয়াছেন, কিভাবে খেদমত গোজারীর কাজ করিয়াছেন সে সম্পর্কে তাঁহার সহধর্মিণী হযরত খাদিজা সিদ্দীকার একটি সাক্ষ্য বুখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা সিদ্দীকা হযরত রসূলুল্লাহকে প্রথম নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনায় বলিতেছেন–

كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق

আপনার অভ্যাসগত স্বভাবে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন–

১. আপনি আত্মীয়গণের সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

২. যাহারা বার্ধক্যের কারণে, রুগ্নাবস্থার কারণে, বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণে অথবা ইয়াতীম, বিধবা হওয়ার কারণে রুজি-রোজগার করিতে অক্ষম তাহাদের ভরণ-পোষণের খেদমত আপনি নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন, তাহাদের খেদমত করাকে আপনি আপনার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

৩. যাহারা কার্যক্ষম অথচ বেকার সমস্যার কারণে রুজি-রোজগার করিতে পারে না, তাহাদের রুজি-রোজগারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার খেদমত আপনি নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছেন।

৪. অতিথি সেবা এবং মেহমানের খেদমতকে আপনি নিজের জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

৫. আসমানী বালার কারণে যখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়, সেইসব বিপদগ্রস্ত, দুঃস্থ মানবতার সেবার জন্য সর্বদা আপনি অগ্রসর হইয়া থাকাকে নিজের জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই গুণগুলি যাঁহার মধ্যে থাকে আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি আল্লাহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই মদদ করেন, আল্লাহ তাঁহাকে মদদ করিতে কখনও ত্রুটি করেন না।

নবুওয়াত পাওয়ার পরও হযরত খেদমত করিয়াছেন, মক্কী জীবনেও খেদমত করিয়াছেন, মাদানী জীবনেও খেদমত করিয়াছেন। মক্কী জীবনের একটি ঘটনা এবং মাদানী জীবনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষ্যান্ত হইতেছি–

**মক্কী জীবনের একটি ঘটনা**

হযরত রসূলুল্লাহ মক্কার গলিতে প্রত্যুষে বাহির হইয়াছেন। দেখেন যে এক বৃদ্ধা রমণী কতগুলি বোঝা লইয়া অতি কষ্টে কোথায় যেন যাইতেছেন। বৃদ্ধার কষ্ট দেখিয়া হযরতের দিল গলিয়া গেল। আগে বাড়িয়া বলিলেন, মা, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আপনার তো বড়ই কষ্ট হইতেছে, আপনার বোঝাগুলি আমাকে দেন, আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দেই। অসহায় বৃদ্ধা এমন সময়ে এমন সাহায্যকারী পাইয়া কত যে খুশী হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। খুশীতে বোঝা যুবকের ঘাড়ে দিয়া বৃদ্ধা তাহার মনের দুঃখের সব কথা এক এক করিয়া যুবকের কাছে বলিতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহার মনের সাধ মিটাইয়া মুহাম্মদকে গালি দিতে লাগিল, মুহাম্মদই ঘরে ঘরে বাপ-বেটায়, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছে। মুহাম্মদ লোকটি ভাল লোক ছিল, কেমন করিয়া তাহার এইরূপ মাথা খারাপ হইল? এত উৎপাত আর সহ্য করা যায় না। বাপ-দাদার ধর্মের নিন্দা আর বরদাশত করা যায় না। সেই জন্য বাবা আমি মনস্থ করিয়াছি আমি আর এই দেশে থাকিব না। সেই জন্য দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি। বুড়ির খবর ছিল না সে যত কুৎসা করিতেছে, যত গালি দিতেছে, স্বয়ং তাহার সাহায্যকারীর কুৎসা বর্ণনা করিতেছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের পাহাড়। তিনি নীরবে সব শুনিতেছেন আর বুড়ির সাথে সাথে তাহার বোঝা লইয়া হাঁটিতেছেন। বুড়ি যখন তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছে তখন বুড়ি জিজ্ঞাসা করে বাবা তুই কে? তুই আমার যে উপকার করলি এমন উপকার তো কারুর পেটের পুতেও করে না! তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মা আমিই সেই মুহাম্মদ যে মুহাম্মদ সম্পর্কে আপনি এত কিছু বলিতেছেন।

বুড়ি এই বাক্য শুনিয়া হতভম্ভ হইয়া হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, বাবা! তুমি তো মানুষ নহ তুমি তো দেবতা, তুমি তো ফেরেশতা। তোমার মত ফেরেশতা-খাসলত লোকের বিরুদ্ধে লোকেরা আমার কাছে এত মিথ্যা অপবাদ রটাইয়াছে। বাবা! আমি তোমার কালিমা পড়িতেছি তোমার ধর্মই সত্য,

আমাকে তোমার ধর্মে দীক্ষিত করিয়া নাও।

**মাদানী জীবনের একটি ঘটনা**

একদা একদল লোক আসিয়া মদীনায় মেহমান হইল। দলের মধ্যে একটি লোক ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। আসহাবগণের নিয়ম ছিল তাঁহারা মেহমানগণকে ভাগ করিয়া একজন দুইজন করিয়া এক একজনে নিয়া যাইতেন। অন্যান্য মেহমানদেরে তাঁহারা নিয়া গেলেন কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোকটিকে কেউ নিল না। সে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহর এখানেই থাকিয়া গেল। দুষ্ট লোকটি খানা খাওয়ার সময় ইচ্ছা করিয়াই অনেক বেশী খানা খাইল যাতে হযরতের ঘরের লোকদের তকলীফ হয়। খানা খাওয়াইয়া হযরত বিছানা করিয়া দিয়া মেহমানকে শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দুষ্ট মেহমান মলমূত্রের দ্বারা সমস্ত বিছানা-কাপড় নষ্ট করিয়া রাখিয়া অন্ধকার থাকিতে পলায়ন করিয়াছে। সকালে হযরত আসিয়া বিছানা-কাপড় নষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, না জানি রাত্রে আমার মেহমান কত কষ্ট পাইয়াছে। এইরূপ আফসোস প্রকাশ করিয়া হযরত নিজ হাতে এইসব ময়লা সাফ করিতে লাগিলেন, নিজ হাতে বিছানা কাপড় সব ধুইতে লাগিলেন। আসহাবগণ কিছুতেই হযরতকে ধুইতে দিবেন না, তাহারা ধুইবেন এই বলিতেছেন। কিন্তু হযরত বলিতেছিলেন, না, আমার মেহমান আমারই ধোয়া উচিত, মেহমানের খেদমত আমারই করা কর্তব্য। নতুবা অন্য কেহ এই কাজ করিয়া দিলে আমার মেহমান যখন জানিতে পারিবে তখন সে অপেক্ষাকৃত বেশী লজ্জিত হইবে এবং মনে বেশী কষ্ট পাইবে। সুতরাং বিছানা কাপড় তোমরা কেহই ধুইওনা, আমিই ধুইব।

ঘটনাক্রমে মেহমান ভুলিয়া তাহার তরবারী ফেলিয়া গিয়াছিল। তরবারীর মায়া পরিত্যাগ করা সহজ ছিল না। সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া তরবারীর তালাশে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত যখন উপরোক্ত কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা সাহাবাগণের মধ্যে এবং হযরতের মধ্যে হইতেছিল। লোকটি এইরূপ আখলাক দেখিয়া আর থাকিতে পারে নাই। তাহার পাথর দিল গলিয়া মোম হইয়া গিয়াছে। কঠোরতার সামনে পাথর গলে না। কোমলতার সামনে অনেক সময় পাথর গলিয়া যায়। লোকটি হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল আপনি সত্য নবী, আপনার ধর্ম সত্য, আমাকে আপনার কালিমা পড়ান, আমাকে আপনার ধর্মে দীক্ষিত করুন। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'।

দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক এখনও খলীফা হন নাই। হযরত আবূ বকর ছিলেন খলীফা। মদীনার এক প্রান্তে এক অন্ধ বুড়ির বাড়ী। হযরত ওমর খেদমতের তালাশে বাহির হইয়া বুড়ির বাড়ীতে পৌঁছিলেন। রোজ হযরত ওমর নির্দিষ্ট সময় বুড়ির বাড়ীতে আসিতেন। কিন্তু আসিয়া দেখিতেন কে যেন আগেই বুড়ির সব কাজ করিয়া গিয়াছে। বুড়ির বাজার সদাই করিয়া দেওয়া, লাকড়ি কাটিয়া দেওয়া, খানা পাকাইয়া দেওয়া, পানি আনিয়া দেওয়া, ঘরে ঝাড়ু দিয়া দেওয়া, বিছানা কাপড় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, মাঝে মাঝে রোদে শুকাইয়া দেওয়া, উযূ-গোসলের পানি তৈয়ার করিয়া দেওয়া, এমনকি বৃদ্ধ বয়সে অপারগ থাকায় ঘরে পেশাব-পায়খানা করিয়া রাখিলে তাহাও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এইগুলি ছিল বুড়ির বাড়ীর কাজ। কিন্তু রোজই হযরত ওমর আসিয়া দেখেন কে যেন তাহার আগেই আসিয়া সব কাজ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বুড়ি জানেন না কে আসিয়া সব কাজ করিয়া চলিয়া যায়। স্বয়ং খলীফা যে সব কাজ করিয়া যান, তাহা কেহ ভাবিতেই পারে নাই।

কিন্তু যেদিন হযরত আবূ বকরের ইন্তিকাল হইয়াছে, সেদিন যখন হযরত ওমর বুড়ির বাড়ীতে গিয়াছেন, তখন দেখেন যে, আজ আর কেহ বুড়ির কাজ করিয়া দিয়া যায় নাই। হযরত ওমর বুঝিতে পারিলেন যে, স্বয়ং খলীফাই আসিয়া তাঁহার আগে বুড়ির সব কাজ করিয়া যাইতেন। হযরত ওমরও তারপর বুড়ির জীবন পর্যন্ত তাহার খেদমতের কাজ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া রাত্রে গাশ্‌ত (ঘুরাফিরা) লাগাইয়া দুঃস্থ জনগণের খবরা-খবর লওয়া যে হযরত ওমরের অভ্যাস ছিল, সে কথা সকলেরই জানা আছে।

প্রাথমিক যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনই ছিলেন সবচেয়ে বড় লায়েক এবং বড় বুযুর্গ এবং তাহারাই সবচেয়ে বেশী হযরত রসূলুল্লাহর সুন্নাতের পায়রবী করিতেন এবং তাঁহারাই সবচেয়ে বেশী হযরত রসূলুল্লাহর আদর্শ-চরিত্রে চরিত্রবান হইতেন। পরে খলীফাগণের চরিত্রে অন্য জিনিস ঢুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু যেহেতু হযরত রসূলুল্লাহ তাকীদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন খেদমতে খালকের কথা–

سيد القوم خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقونه بعمل الا الشهادة

কওমের নেতা সেই যে কওমের খেদমত করিবে। খেদমতের কাজে যে অগ্রণী হইবে তাহার মর্তবার চেয়ে বড় মর্তবা হাসিল করার জন্য অন্য কোন আমল নাই, একমাত্র জিহাদের মধ্যে গলা কাটাইয়া শহীদ হওয়া ব্যতিরেকে।

বলাবাহুল্য যে, এই খেদমত স্বার্থ প্রণোদিত খেদমত নহে। ভোট পাওয়ার আশায় বা আমার বিপদের সময় সে উপকার করিবে এই আশায় যে খেদমত করা হয় সে খেদমতের জন্য এই ফযীলত বর্ণনা করা হয় নাই। এই ফযীলত সেই খেদমতের জন্য, যে খেদমতের মধ্যে আল্লাহর মাখলুকের খেদমত করিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন মাকসূদ নাই। এই জন্যই পরবর্তী যুগে তরীকতের প্রধান মাশায়েখগণ আপন মুরীদগণকে খেদমতে খালকের মশ্‌ক করাইয়াছেন। খালেস নিয়তে খেদমত করার অভ্যাস করাইয়াছেন।

শায়েখ সা'দী বলিয়াছেন,

طریقت بجز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে খেদমতে খালকের রেয়াজত করিতে হইবে। নতুবা শুধু তালি দেওয়া কাপড় পরিলে, লম্বা তাসবীহ হাতে রাখিলে বা জায়নামায কাঁধে করিয়া বেড়াইলে তার দ্বারা সুফী হওয়া যাইবে না। তাহার দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না।

এই ধরণের সর্বস্বীকৃত বাক্যরূপে প্রচলিত তরীকতের মধ্যে আরও মশহুর আছে هر که خدمت کرد او مخدوم شد যে খেদমত করে সে পরে খেদমত পায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য খেদমত এমন জিনিস যে বিধর্মীরাও যদি খেদমত করে তবে দুনিয়াতে তাহাদেরও তরক্কী হইবে কিন্তু ঈমান না থাকার দরুন আখেরাতে তাহারা কিছুই পাইবে না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ খেদমত করিলে দুনিয়ায় উন্নতি হইবে আর আখেরাতের সওয়াবও তাহারা পাইবেন। এই জন্যই সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস নাসারাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, শেষ যামানায় তাহাদের প্রাধান্য লাভ হইবে

এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে ৫টি গুণ আছে–

১. তাহারা বড়ই ধৈর্যশীল।

২. তাহারা বড়ই অধ্যবসায়ী।

৩. তাহারা একবার অকৃতকার্য হইয়া বসিয়া থাকে না। কৃতকার্যতা হাসিল করার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে।

৪. ইয়াতীম, বিধবা এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করে।

৫. তাহারা জালিম বাদশাহর জুলুম হইতে জনগণকে রক্ষা করে।

এই কাজগুলি জনসেবা এবং খেদমতে খালকেরই কাজ। এর কারণে তাহাদের দুনিয়ার তরক্কী হইবে। যখন মুসলমান খলীফাগণ এই কাজ করিতেন, তখন মুসলমানগণেরই তরক্কী ছিল, তাহাদেরই প্রাধান্য ছিল।

এখন মুসলমান রাষ্ট্রপতিগণ বিলাস ব্যসনে, খামখেয়ালীতে মত্ত হইয়াছেন। এই জন্যই মুসলমানদের তরক্কী হইতেছে না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা মুজাফফার হুসাইন কান্দলবী। তিনি একদিন দ্বিপ্রহর বেলায় দিল্লী হইতে বাড়ী আসিতেছেন। পথে দেখেন যে, এক বৃদ্ধ একটি লাকড়ির বোঝা অতি কষ্টে মাথায় করিয়া নিয়া যাইতেছে। মাওলানা সাহেব আগে বাড়িয়া বৃদ্ধকে বলিলেন– বড় মিয়া আপনার বোঝাটি আমাকে দেন, আপনার বড় কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধ বলিলেন, না বাবা আল্লাহ তোমার হায়াত দারাজ করুন। তোমাকে ভাল মানুষের ছেলের মত দেখা যাইতেছে, তোমাকে কষ্ট দিব না। আমার বোঝা আমিই বহিয়া নিব। মাওলানা সাহেব বলিলেন, না বড় মিয়া আপনি বৃদ্ধ, আমি যুবক, আপনার সাহায্য করা আমার কর্তব্য, আমাকে দেন। এই বলিয়া মাওলানা সাহেব বৃদ্ধের থেকে বোঝাটি নিজের মাথায় নিয়া বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার মত কথা বলিতে বলিতে হাঁটিয়া বৃদ্ধের বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। মাওলানা সাহেব একটুও লজ্জাবোধ করিলেন না। শেষে যখন বৃদ্ধ জানিতে পারিল যে, ইনি বড় একজন বুযুর্গ আলেম, তখন বৃদ্ধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল কিন্তু মাওলানা সাহেব বলিতে লাগিলেন, বাবা আমি আমার কর্তব্য কাজ করিয়াছি, আপনি কোন অন্যায় করেন নাই।

চতুর্দশ শতাব্দীর একজন বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী। তাঁহার বাড়ীতে একজন হিন্দু মেহমান হইয়াছে। মাওলানা সাহেব নিজ হাতে হুক্কা সাজাইয়া মেহমানকে খাওয়াইয়াছেন, নিজ হাতে মেহমানের পাও টিপিয়া দিয়াছেন, মেহমানকে পাখা করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর আর একজন বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী। একদিন রেলগাড়ীতে যাইতেছেন। একজন পথিকের কাজায়ে হাজতের দরকার পড়িয়াছে। কিন্তু অন্য লোকেরা পায়খানাকে গলিজ করিয়া রাখিয়াছে, সেইজন্য পথিক পায়খানার উক্ত অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মাওলানা সাহেব এই অবস্থা টের পাইয়া নিজে উঠিয়া পায়খানার ভিতর ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া লইয়া সমস্ত পায়খানা নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিয়া ঐ পথিককে বলিতেছেন– দেখুন সাহেব! এখন যান, আমি দেখিয়া আসিয়াছি কে যেন পায়খানা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মাওলানা সাহেব অপরিচিত পথিকের উপকারের জন্য ময়লা সাফ করার কাজ করিতে একটুও লজ্জা, অপমান বা হীনতা বোধ করেন নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন অতি বড় বুযুর্গ ছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী। তাঁহার নিকট বেদআতী ফকীরের একদল লোক মেহমান হইয়াছেন। ফকীরদের সঙ্গে ছিল ডোম, মেথর যাহারা ফকীরদের খেদমতের জন্য মোতায়েন ছিল। মাওলানা সাহেব ঐসব ডোম মেথরদের খেদমত নিজ হাতে করিয়াছেন। তাহাতে তিনি একটুও সংকোচবোধ করেন নাই। তিনি নিজ হাতে শিয়া মুজতাহিদদেরকে হুক্কা সাজাইয়া খাওয়াইয়াছেন, তাহাদের গাও পাও টিপিয়া দিয়া মেহমানের হক আদায় করিয়াছেন। তাহাতে তিনি মাওলানাত্বের মানহানী একটুও বোধ করেন নাই।

এই ধরনের আখলাক, এই ধরনের খেদমতে খালকের জযবা আবার যেই দিন আলেম সমাজে এবং মুসলিম সমাজে জাগিবে সেই দিন আবার মুসলিম জাতির উন্নতি ও মর্যাদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

[*সংগ্রহ: রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রদূত, মুজাহিদে আযম, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৯*]

# শান্তি সম্প্রীতি ও উদারতার ধর্ম ইসলাম

**মাওলানা মুহাম্মদ আবূ সাইম**

নামে যার শান্তির আশ্বাস তার ব্যাপারে আর যাই হোক, সন্ত্রাসের অপবাদ দেয়ার আগে তার স্বরূপ উদঘাটনে দু'দণ্ড চিন্তা-ভাবনা, কিছুটা অধ্যয়ন এবং নিরপেক্ষ গবেষণা জ্ঞানের দাবী ছিল বৈকি। যথার্থ প্রমাণ ব্যতীত কোন ঘটনার দায়ভার কোন জাতি বা ধর্মাদর্শের উপর চাপানো নেহাত বোকামি, চরম হঠকারিতা ও বেইনসাফী। কিন্তু পাশ্চাত্যবাদীরা অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে মুসলমানদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বলে প্রচার করে চলছে। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত বর্তমান মুসলিম সন্ত্রাসবাদিতার বেশিরভাগই মূলতঃ ইহুদী-খৃস্টবাদী চক্রের চক্রান্তে সৃষ্ট বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ফাঁদা নীল নকশার খণ্ডাংশ বৈ কিছুই নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এসব ঘটনার পেছনে উৎপীড়িত নিগৃহীত বিচার-বঞ্চিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা দলের হতাশার প্রকাশ হিসেবেও দু'একটি অপতৎপরতা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু সেটাকে কোনভাবেই সামগ্রিকতার মোড়কে উপস্থাপন করা উচিত হবে না। কেননা, ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। তাছাড়া অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যার সীমালঙ্ঘন ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

ইসলাম শান্তির ধর্ম– একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন ছিল না যদি না হলুদ সাংবাদিকতার অভিশাপে আমাদের মন-মগজ ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হতো। বস্তুতঃ অপবাদের অপনোদন এবং সত্যানুসন্ধানীদের আন্তরিক প্রশান্তির জন্যই এ প্রয়াস। যারা বিভ্রান্ত, কুরআনের ভাষায় যাদের হৃদয় মোহরাংকিত এবং ব্যাধিগ্রস্ত তাদের সুবুদ্ধির উদয়ও আমাদের একান্ত কামনা।

ইসলাম সন্ত্রাস কি-না তা জানতে হলে সন্ত্রাসের পরিচয়, সন্ত্রাস সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, সন্ত্রাস নির্মূলে ইসলামের পদক্ষেপ, ইসলামের শান্তি সম্প্রীতি, উদারতা ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ তথা কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে সবিস্তার আলোচনা আবশ্যক।

**সন্ত্রাস কী?**

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্যমতে– Terrorism, the systematic use of terror or unpredictable violence against governments publics or individuals to attain a political objective. অর্থাৎ, সন্ত্রাস হচ্ছে ত্রাসের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার। অথবা কোন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র, জনগণ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রব তার 'সন্ত্রাস : গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিপন্থী' প্রবন্ধে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন– "প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অবৈধভাবে এমন কোনো হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যার মাধ্যমে জীবন, সম্পদ অথবা শান্তির ক্ষতিসাধন হয় অথবা সামাজিক বা ব্যক্তি জীবন হুমকির সম্মুখীন হয় তখন এরূপ মানবীয় অপতৎপরতাকে সন্ত্রাস বা terrorism বলে।" আরো সংক্ষেপে বলা যায়, যে কার্যাবলী গণমানুষের জন্য ক্ষতিকর; যে অপরাধ মানবতা বিধ্বংসী ও শান্তির হন্তারক তাই সন্ত্রাস। এছাড়াও বিভিন্নজন সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন বিভিন্নভাবে। সেসব সংজ্ঞায় মৌলিক তেমন কোন পার্থক্যও দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে সমস্যা সৃষ্টি হয় প্রয়োগক্ষেত্র নিয়ে। তার কারণ দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য। ফলে দেখা যায় একই ব্যক্তি একই কাজের জন্য কারো কাছে নিন্দিত, কারো কাছে নন্দিত। একজন তাকে চিহ্নিত করে বিশ্বসেরা সন্ত্রাসীরূপে, অপরজন তাকে দেয় বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা। এজন্য সৃষ্টির একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্রষ্টার নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের মধ্যবর্তী অনতিক্রম্য পার্থক্য বিবেচনা অপরিহার্য। অন্যথায় অন্যায় যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বনী আদমের ঘাতকও নিজেকে শান্তিবাদী ভাবতে পারে। কুরআনের ভাষায়- 'তাদের বলা হয় পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। ওরা বলে আমরাই তো শান্তিবাদী।' (সূরা বাকারা : ১১) আজ পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে আমরা এ চিত্রটিই দেখতে পাই।

**সন্ত্রাস : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি**

ইসলামের বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না আছে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নীতি। কাজেই আল্লাহর পথে বাধাদান, অন্যায়ভাবে দেশ হতে বহিষ্কার, ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা-ফাসাদ, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, লুটতরাজ-খুন, ধর্ষণ-ব্যভিচার, সম্ভ্রমহানি ও প্রাণনাশের হুমকি এ জাতীয় যাবতীয় জুলুম ও শান্তি-বিনাশী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে ইসলামের অবস্থান। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো নিষিদ্ধ, হারাম ও জঘন্য পাপ। ইরশাদ হচ্ছে– 'যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং এতে বক্রতা খুঁজে তারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।' (সূরা আ'রাফ : ৪৫) 'আল্লাহ আমাদের রব একথা বলার অপরাধে যাদেরকে তাদের বসতভিটা থেকে উৎখাত করা হয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।' (সূরা হজ্জ : ৪০)

'ওরা সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ...। আর আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ।' (সূরা বাকারা : ২১৭) 'ধর্ম গ্রহণে- জবরদস্তি নেই' (সূরা বাকারা : ২৫৬) 'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।' (সূরা নিসা : ২৯) 'যারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে।' (সূরা নিসা : ১০) 'ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ চুরি করতে পারে না।' (বুখারী; ৫৫৭৮)

'খুনি এবং লুটেরা ডাকাতকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা, শুধু খুনি ডাকাতের জন্য মৃত্যুদণ্ড, লুটেরার বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন এবং ভীতি প্রদর্শনকারীর দেশান্তরের দণ্ড ইসলামের বিধান।' (সূরা মাইদা : ৩৩) 'যে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্যে ছিনতাই করল সে আমার

দলভূক্ত নয়।' (ইবনে মাজাহ : ৩৯৩৭) 'যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের মধ্য হতে নয়।' (মুসলিম : ১৬১-৯৮) 'পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করেনি এমন কাউকে হত্যা করা সমগ্র মানব হত্যারই নামান্তর।' (সূরা মাইদা : ৩২) 'ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, তা অশ- ীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২) 'যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের পীড়া দেয় এমন অপরাধের জন্য যা তারা করেনি, তারা বহন করে অপরাধ ও সৃষ্টপাপের বোঝা।' (সূরা আহযাব : ৫৮) 'জুলুম কিয়ামত দিবসে অন্ধকার রূপ পরিগ্রহ করবে।' (বুখারী : ২৩১৫) উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দৃষ্টে সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই অনুমেয়।

**সন্ত্রাস নির্মূলে ইসলামের যুগান্তকারী পদক্ষেপ**

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের আয়োজন দেখে সকলকে সত্যিই অভিভূত হতে হবে। অনাগত যে শিশুটি তার পিতার পৃষ্ঠদেশে শুক্রবিন্দুরূপে অবস্থানরত, সেখান থেকে তার মায়ের গর্ভাশয়ে নির্গমন প্রক্রিয়াতেও যেন সে অবাধ্য শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে সে জন্য পিতা-মাতাকে মিলন-পূর্বে আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া বিধেয় করে দেয়া হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই নবজাতকের কানে আযান-ইকামত শোনানোর মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে তাকে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, 'মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই তোমার জীবনের মিশন।' বস্তুতঃ এটাই তার জীবনের প্রথম পাঠ। আসলে অবুঝ শিশুর হৃদয় পরিচ্ছন্ন শে- ট সদৃশ। পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের কার্যকলাপ অথবা আকস্মিক কোন ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রভাব ও প্রচ্ছায়া নবজাতকের মনে অঙ্কিত হওয়া এমনকি গর্ভকালীন মায়ের আচরণও শিশুর পরবর্তী জীবনে রেখাপাত করা বিজ্ঞান সমর্থিত বটে। এ জন্যই জীবনের প্রথম প্রহরে এতসব সতর্কতার আয়োজন। এরপর শিশুর সুন্দর নাম রাখা, তাকে উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া এবং পরিণত বয়স পর্যন্ত তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা অভিভাবকের কর্তব্য। 'সন্তানের উপর পিতার তিনটি দায়িত্ব- সুন্দর নাম রাখা, প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়া ও উপযুক্ত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা করা'। (শু'আবুল ঈমান : ৮৬৬৬)

বলুন, শয়তানের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত মাতৃজঠরে যে মানুষটি বেড়ে ওঠে। জন্মের পরক্ষণেই যে পায় তার পথের সন্ধান, সুন্দর নামের ছোঁয়া যার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে রাখে। সর্বোপরি উত্তম নৈতিকতা ও ওহীর জ্ঞান যার ভূষণ ও অলংকার। সে কেমন করে সন্ত্রাসের অন্ধকার গলিপথে পা বাড়ায়! অবাধ্যতার ঘাট মাড়ায়! তা সত্ত্বেও যদি কেউ সন্ত্রাসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে তা প্রতিহত করা ও প্রতিকারের দায়িত্ব সকল মানুষের। 'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১১) 'তাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেয়া হলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজে আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে।' (সূরা হজ্জ : ৪১) 'তোমাদের কেউ অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে নিজ শক্তি বলে তা প্রতিহত করবে।' (মুসলিম : ৫০) পিতা-মাতার দয়ার্দ্র শাসন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলমানদের অনুরোধ উপদেশ উপেক্ষা করে যারা সন্ত্রাসে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখায় তাদের প্রতিবিধানে রয়েছে শরীয়তের বজ্রকঠিন বিধি নিষেধ।

নরহত্যার মত জঘন্যতা প্রদর্শনের পৈশাচিক দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনকারীর শাস্তি কুরআনের ভাষায়- 'নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস তথা মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হল।' (সূরা বাকারা : ১৭৮) নিহত নারী হোক বা নর; মুসলিম হোক বা অমুসলিম, ধনী হোক বা গরিব হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

খলীফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে এক অমুসলিমকে হত্যা করে বসে একজন মুসলমান। উমর (রা.) স্পষ্ট ঘোষণা দেন, যদি মৃতের অভিভাবকেরা রক্তপণে রাজি না হয়, তাহলে এ ঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দিব আমি। হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলেও পুনরাবৃত্তি ঘটে অনুরূপ বিচারের। শুধু ঘাতকই নয়, ভুলবশতঃ হত্যাকাণ্ডে ঘাতকের আত্মীয়-স্বজনকেও টানতে হবে রক্তপণের বোঝা। (ফাতাওয়া শামী : ৬/৫৭৩) এমনকি অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত লাশ যে এলাকায় পাওয়া যাবে সেখানকার অধিবাসীদেরও সম্মুখীন হতে হবে কঠিন জবাবদিহির। (ফাতাওয়া শামী : ৬/৬২৬ কিতাবুল কাসামাহ) যাতে সম্মিলিত সতর্কতা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় বন্ধ হয় নরহত্যার মত জঘন্য অপরাধ। 'ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কিংবা একশত বেত্রঘাত।' (সূরা নূর : ২) 'চোর নারী হোক বা পুরুষ তার হাত কেটে দাও।' (সূরা মাইদা : ৩৮) 'খুনি ও লুটেরা ডাকাতকে শূলিতে চড়ানো হবে, লুটেরা ও ছিনতাইকারীর হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে।' প্রাণনাশের হুমকিদাতাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা নির্বাসন (সূরা মাইদা : ৩৩) 'মান সম্ভ্রমহানির কাজে শরীয়তে ৩ থেকে ৩৯ বেত্রাঘাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।' (ফাতাওয়া শামী; ৬০, ৬৭) তথ্য সন্ত্রাসের মোকাবেলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা কুরআনী বিধান 'যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসো।' (সূরা হুজুরাত : ৬)

সর্বোপরি আল্লাহর পথে বাধাদানকারী, অন্যায়ভাবে বসতভিটা থেকে উৎখাত ও মজলুমের ন্যায্য অধিকার হরণকারীসহ পৃথিবীময় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে সদা প্রস্তুত ইসলামের মহান মুহাফিজ-জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। মূলতঃ এ বজ্রকঠিন শাসনদণ্ডের মাধ্যমেই সকল সন্ত্রাসের লাগাম টেনে ধরেছিল ইসলাম। তাছাড়া মানব রচিত দণ্ডবিধির মত ইসলাম শুধু আইন রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে খোদাভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে। আর এখানেই ইসলামের স্বতন্ত্রতা। যার অনুসরণই এ অস্থির একবিংশ শতাব্দীতে উপহার দিতে পারে আরেকটি সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব।

**জিহাদ বনাম সন্ত্রাস**

প্রসঙ্গত জিহাদের কথা এসে যায়। কেননা, ইসলামকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে জিহাদ। তাছাড়া ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে যে ভুল ধারণা রয়েছে তার নিরসন হওয়াও একান্ত দরকার। মনে রাখতে হবে, ইসলাম হচ্ছে 'complete code of

life' অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানে শিষ্টের লালনের সাথে সাথে দুষ্টের দমন নীতিও যে আবশ্যক এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত অঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করা আক্রান্তের উপর জুলুম নয়; এহসান, দয়া ও সহমর্মিতা। ইরশাদ হচ্ছে, 'তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো, যখন সে জুলুমের শিকার হয় অথবা হয় জুলুমকারী। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাকে আক্রান্ত হলে সাহায্য করবো, কিন্তু যখন সে জালেম তখন আমি কীভাবে তার সাহায্যকারী হবো? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'তুমি তাকে জুলুম থেকে নিবৃত করবে। এটাই তার উপর অনুগ্রহ ও সাহায্য।' (বুখারী : ৬৯৫২) কাজেই জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে একীভূত করে ফেলাটা অদূরদর্শিতা ও জ্ঞান স্বল্পতারই পরিচায়ক হবে।

জিহাদ কী? জিহাদ মজলুম মানবতার রক্ষাকবচ। জিহাদ নির্যাতনের প্রতিবাদমুখর তীব্র ভাষা। জিহাদ অসহায়ের নিরাপত্তা, বঞ্চিতের অধিকার। জিহাদ ইজ্জতের গ্যারান্টি, শান্তির হাতিয়ার। জিহাদ সন্ত্রাস নয়, সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যই জিহাদের অবতারণা। দেখুন, জিহাদের বৈধতা দানকারী কুরআনের আয়াত– 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।' (সূরা হজ্জ : ৩৯) ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যতক্ষণ না ফেতনা দূরিভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' (সূরা আনফাল : ৩৯)

জিহাদ সাম্রাজ্যবাদীদের তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী শে- াগানের আড়ালে রাজ্য দখলের পাঁয়তারা নয়। জিহাদ নয় অন্যায়ভাবে গণহত্যা, গণধর্ষণ আর লুণ্ঠনের নাম। জিহাদ এক খোদায়ী রহমত যা সকল ধর্মের, সকল মানুষের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং রক্ষা করে মঠ, মন্দির, গির্জা, মসজিদ। ইরশাদ হচ্ছে– 'আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে বিধ্বস্ত হত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ- যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।' (সূরা হজ্জ : ৪০) জিহাদ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, ইহুদী নিধনের জন্যও নয় জিহাদ এবং কিতালের ফয়সালা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধমুক্ত পৃথিবী গড়ার স্বপ্নেও নয়। মুজাহিদের নাঙ্গা তরবারী শুধুই জালিমের জন্য। চাই সে যে ধর্ম-বর্ণ গোত্র-বংশেরই হোকনা কেন। সকল অহংকারীর উদ্ধত শির থেঁতলে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাই জিহাদের পয়গাম। 'কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়রূপে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়।' (সূরা শুরা : ৪২) জিহাদ ধ্বংস নয়, সৃষ্টির মহা উল্লাস। রণাঙ্গনের আগুনে প্রহরেই সে ইস্পাতকঠিন আর যুদ্ধ শেষে বিপন্ন মানবতার নিষ্ঠাবান মুহাফিজ।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হল। বন্দী হল সত্তর জন কুরাইশ কাফের। কোন কানুন তো ছিল না, ছিল না জেনেভা কনভেনশনের ফাঁকা বুলি। তবুও সাধারণ বন্দীদের দশ জন করে মুসলমানকে লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হল। বন্দীদের পোশাক আশাকের ব্যবস্থা করা হল। আহারের জন্য একেকজন বন্দীকে বণ্টন করে দেয়া হল সাহাবাদের মধ্যে। সাহাবারা নিজেরা অর্ধাহারে অনাহারে থেকে তাদেরকে পেট পুরে খেতে দিতেন। হুনাইনের যুদ্ধে ছয় হাজার বন্দীকে কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই আযাদ করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানেও নারী-শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী : ৩০১৪)

অতএব, জিহাদের ধুয়া তুলে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্মরূপে চিহ্নিত করার অবকাশ নেই। তবে কথা হল, জিহাদ করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায়, সঙ্গীন পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট শত্রুর মোকাবেলায়। যষ্টি মধু যেমন মধু নয়- তেমনি অহেতুক ত্রাস সৃষ্টিও জিহাদ নয়। নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশে মুসলমানদের উপর আক্রমণ তো চরম পাশবিকতা ও নিদারুণ বর্বরতা। মদ মদ-ই; ইসলামী লেবেল তাকে হালাল বানাতে পারে না। কেননা, জিহাদের রয়েছে শরীয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বিধিবদ্ধ কানুন। কাজেই জিহাদের নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ সন্ত্রাস করলে তার জন্য দায়ী হবে স্বয়ং সে সন্ত্রাসী, জিহাদ নয়।

**ইসলাম সন্ত্রাস নয়**

ইসলাম সন্ত্রাস নয়। একটু ঠাণ্ডা মাথায় খ্রিস্টীয় ছয় শতকের পৃথিবীর দিকে তাকাই। দেখি ইতিহাস কী বলে–

সন্ত্রাসের হিংস্রাঘাতে বিশ্ব সভ্যতা তখন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল মানবতা ও মানবাধিকার। ফারাওদের হাজার হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস নীলের জলে ডোবার আয়োজন করছিল। সভ্যতার তথাকথিত পীঠস্থান রোম-পারস্যের বালাখানা থেকে ভেসে আসছিল মজলুম ক্রীতদাসের আর্তচিৎকার। চীনের মহাপ্রাচীর ছাপিয়ে উৎপীড়িতের আহাজারী আঘাত হানছিল আকাশের দ্বারে। শূদ্র-বৈশ্যের ক্রন্দনরোল ধ্বনিত হচ্ছিল সিন্ধুর তীরে তীরে। মরু আরবের প্রখর উত্তাপও অবলা নারীর আঁসু মুছতে ব্যর্থতার গ্লানি সইছিল। এমনই অস্থির হয়ে উঠেছিল সেদিন এ পৃথিবী। কবির ভাষায়–

কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম,
শুন্য অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম।
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু।

সন্ত্রাসের জহর-আলুদা পৃথিবী তখন কামনা করছিল এমন এক কুদরতী কারিশমার, যা বিষহরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং উপড়ে ফেলবে সন্ত্রাস-বৃক্ষের শিকড়। অসহায় ইনসানিয়াতের প্রয়োজন ছিল এমন এক জাদুমন্ত্রের, যার তেলেসমাতিতে সন্ত্রাস দাবানল নির্বাপিত হবে দপ করে এক লহমায় আর মানবতা লাভ করবে নতুন জীবন। এমন নাজুক মুহূর্তে কুদরতে খোদাওন্দী সদয় হল মাটির মানুষের প্রতি। প্রেরিত হল সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অবতীর্ণ হলো সন্দেহাতীত কিতাব আল কুরআন। আগমন ঘটলো দীন-ইসলামের। ইনকিলাব সূচিত হল পাপ-পঙ্কিলতার অভয়ারণ্য অন্ধকার পৃথিবীতে।

মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধান। দেবতা-পূজারীর মুখে আজ কাবার রবের জয়গান। দুর্ধর্ষ খুনী আজ ইনসানিয়াতের মুহাফিজ, মানবতার ত্রাণকর্তা। ব্যভিচারীর নিকট ব্যভিচার অপেক্ষা ঘৃণিত কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। জীবন্ত কন্যার কবরদাতা নিষ্ঠুর পাষাণ পিতা লজ্জিত-শঙ্কিত! কন্যাই আজ তার কাছে সবচেয়ে আদরণীয়।

উটের পানি পান করানো নিয়ে শুরু হওয়া যুদ্ধ যারা জিইয়ে রাখতো শত শত বছর, আজ তারাই যুদ্ধের বিভীষিকায় নিজের মরণ পিপাষায় অন্যের পানি! পানি! কাতরানিতে হাসি মুখে বিলিয়ে দেয় আপন পেয়ালা। ডাকাতের তলোয়ার কোষাবদ্ধ। চোরের হাত নিজ নিজ পকেটে। ইয়াতিমের মাল ভক্ষণকারী অনন্যোপায়-সতর্ক। বল, সত্যি করে বল, এসব কার দান? নিঃসন্দেহে ইসলামের এবং একমাত্র ইসলামের।

এমন শান্তির ধর্মে যারা সন্ত্রাসের কালিমা জড়াতে চায়, সূর্যালোকে অবগাহন করেও যারা বলে 'নিশুতি রাত, ঘন অন্ধকার' -তারা যুক্তি দেখায়, পর্যবেক্ষণের কাসুন্দি ঘাটে। অদ্ভুত ওদের পর্যবেক্ষণ, হাস্যকর ওদের যুক্তি। ওরা বসে বসে হিসেব কষে আমেরিকার জোড়া টাওয়ার ধসালো কে? মুসলমান। লন্ডনে বোমা ফাটালো কে? মুসলমান। অমুক জায়গায় নাশকতা সৃষ্টিকারী; আরে, সেও তো মুসলমান। ব্যাস, তিন তিনটে স্থানের হিসাব যেহেতু এক ও অভিন্ন অতএব মুসলমানই সন্ত্রাসী; ইসলামই সন্ত্রাস।

জানতে পারি, হিরোশিমা-নাগাসাকি ট্রাজেডির নায়ক কে? কোন শান্তিবাদী মিথ্যা অজুহাতে সন্ত্রাস নির্মূলে সবচেয়ে সফল আফগানিস্তানের কবর রচনাকারী? নিরপরাধ ইরাকের বুকে কার বোমারু-বিমান গর্জায় মুহুর্মুহু? কার বুলডোজার স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনির পাজর গুঁড়ো করে? তোমরা বল, আমেরিকা! তোমরা বল, বৃটেন! তোমাদের সাফ জবাব– ইসরাইল। কেন? আমেরিকানদের কোন ধর্ম নেই? বৃটিশ-ইসরাইলিরা কি কোন ধর্মের অনুসারী নয়? ওদের শান্তি বিনাশী ও মানবতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডগুলো যদি ধর্মান্ধতা হিসেবে পরিচিতি না পায়, স্পষ্ট ভাষায় 'ক্রুসেড' উচ্চারণের পরও যদি ওদের ধর্ম সন্ত্রাস আখ্যায় আখ্যায়িত না হয় তবে কেন পৃথিবীর পথে-প্রান্তে ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনার দায়ভার কেবল ইসলামের ঘাড়েই চাপবে? কেন নির্যাতিত নিপীড়িত অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিত্রতায়ই কেবল সন্ত্রাসের কালিমা জড়াবে? এ বড় বেইনসাফী তোমাদের! বড় একচোখা তোমরা!

ইসলাম সন্ত্রাস নয়; বরং ইসলামের মতো শান্তিপ্রিয় ধর্মের অনুসারীরাই তথাকথিত শান্তিবাদীদের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। ইতিহাসের বিবর্ণ পাতাগুলো এর জ্বলন্ত সাক্ষী। নিরীহ মুসলমানদের উপর মক্কার কাফেরদের অবর্ণনীয় নির্যাতন আক্ষরিক অর্থেই পৈশাচিকতার রূপ ধারণ করেছিল। খুনি বজ্জাতেরা যেখানে নিশ্চিত নিরাপত্তা পেত, সেই 'গ্রীন জোন' কাবা ঘরে কাবার রবের প্রতি সিজদাবনত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় উঁটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া, মরুর আগুনে-বালুর উপর পাথর চাপা দেয়া 'আহাদ! আহাদ!' বোল মুখে বেলাল হাবশী, জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা খাব্বাবের গোশতহীন কোমর, লজ্জাস্থানে নরাধম আবু জাহেল কর্তৃক বর্শাঘাতে সুমাইয়ার নির্মম শাহাদাত, শি'আবে আবু তালিবে বয়কটের তিন তিনটি বছর ঘাস-পাতা আর ছাল-বাকল খেয়ে দিন গুজরান ইত্যাকার হাজারো নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেছে মক্কাবাসী মুসলমানদের উপর। কিন্তু কখনো প্রত্যাঘাতের অনুমতি দেয়নি ইসলাম।

হিজরতের পর প্রতিরোধ-প্রতিশোধের অনুমতি দেয়া হল। ইনসাফের তরবারী স্পর্শ করল জালিমের শাহরগ। একই তলোয়ারের শাণিত ভাগ অবসান ঘটাল জুলুমবাজীর; অপরভাগ টানিয়ে দিল ইনসাফের শামিয়ানা। কালের আবহে মুসলমানদের অসতর্কতায় যখনই সে তলোয়ারে মরচে ধরেছে, তখনই ওই শান্তিবাদীরা হামলে পড়েছে মুসলমানদের উপর। ৪৯২ হিজরী মোতাবেক ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ একজন দায়িত্বশীল খ্রিস্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন–

'বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল যে, যেসব যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে উমরে (রা.) গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে পা ধরে দেয়ালগাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে বাইরে নিক্ষেপ করা হয় ...। পরদিন জ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এর চেয়েও ভয়াবহ ও হৃদকম্প সৃষ্টিকারী নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় ...। নারী-পুরুষ সবাইকে হত্যা করার পর তাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। অবশেষে এই গণহত্যার পরিসমাপ্তি ঘটলে শহরের রক্তাপ্লুত সড়কগুলো আরব বন্দীদের দিয়েই ধৌত করা হয়।'

স্পেনের পট-পরিবর্তনের সাথে জড়িত ইউরোপের রক্তাক্ত ইতিহাস যদি সামনে তুলে ধরা হয়, তবে শান্তিবাদীদের সভ্যতা ও তামাদ্দুনের মুখোশ খুলে পড়বে। খোদ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নবম শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমরাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও গণহত্যাসহ বিবিধ উপায়ে নির্যাতনের মাধ্যমে মুসলমানদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে। শত শত মানুষকে বন্দী করে তাদের চোখের সামনে তাদের সন্তানকে জবাই করা হয়েছে। লাখ লাখ মুসলমান নিজেদের ঈমানের হেফাজতের খাতিরে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে। গ্রানাডার মাঠে মুসলমানদের লিখিত অতি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ৮০ হাজার গ্রন্থের বিপুল ভাণ্ডার আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা ফিলিপের শাসিত এলাকায় আরবী ভাষায় একটি বাক্য উচ্চারণ করাকেও অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে একে একে মুসলমানদের সকল স্মৃতিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। কর্ডোভার দ্বিতীয় জামে মসজিদে একাধিক গির্জা নির্মাণ করা হয়। সেখানে অবস্থিত ১২ হাজার গম্বুজবিশিষ্ট হামরা ও জোহরা নামক পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রাসাদ যা আশহাদু-আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ধ্বনিতে সদা মুখরিত ছিল, তার মধ্যে ত্রিকোণ বিশিষ্ট স্তম্ভ ও গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে যা আজও বিদ্যমান।

১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শাহাদত বরণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কথা আজ কারো অজানা নয়। আর বর্তমান প্রেক্ষাপট তো আমাদের চোখের সামনে। আফগান, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, সিংকিয়াং, মিন্দানাও, গুজরাট, আরাকানসহ গোটা পৃথিবী মুমিনের রক্তে লাল। জন্মভূমি বাংলাদেশের কথা আর নাই বললাম। তবুও মুমিন সন্ত্রাসী; সভ্য পৃথিবীর জন্য হুমকি। বড় চিন্তিত এ পৃথিবী। আসলে অন্যের চোখে সামান্য খড়কুটা পড়লেও মানুষ তা দেখতে পায়, অথচ নিজের চোখের কড়িকাঠও সে উপেক্ষা করে

চলে। মরহুম আকবর এলাহাবাদী চমৎকার বলেছেন-

নিজের ঘরের নেয় না খবর, পরের ঘাড়ে চাপায় দোষ

'তেগের বলে জয় ইসলামের' এমন কথাও কয় বেহুঁশ!

**শান্তির স্নিগ্ধ পরশ**

'(হে নবী!) আমি তা আপনাকে বিশ্ব জাহানের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭) পৃথিবীতে বিরাজিত যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, হানাহানি দূর করে শান্তি স্থাপনের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। উক্ত আয়াত এ কথারই প্রমাণ বহন করে। কিন্তু ইসলামের শান্তি স্রেফ শান্তিকামীর জন্য, উদ্ধৃত জালিমের জন্য ইসলামই বজ্রাঘাত। এ ব্যাপারটি অনেক নামকাওয়াস্তের মুসলমানও ঠিক মেনে নিতে পারেন না বা মেনে নেন না। তাই ইসলামের দুশমনের ঘাড়ে রদ্দা পড়লেই তারা 'মানবতা গেল, মানবতা গেল' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন; 'শান্তিকামী ইসলামের অনুসারীদের এই বুঝি কর্ম! বলে টিপ্পনিও কাটেন কেউ কেউ। মনে রাখতে হবে, অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয়া অত্যাচারেরই শামিল। আর ফোঁড়ার পুঁজ বের করার মধ্যেই গোটা দেহের শান্তি নিহিত। কিন্তু পুঁজ বের করার অধিকার এবং ক্ষমতা কেবল ইসলামী সরকারের এবং মুসলিম আদালতের; প্রজা সাধারণের নয়। কেননা তাতে শান্তি আসে না, কেবল অশান্তিই বাড়ে। এবার দেখুন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের পদক্ষেপগুলো-

হাদীসের বাণী- 'মুসলিম তো সে-যার হাত ও মুখ (এর অত্যাচার) থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে, আর মুমিন সেই ব্যক্তি যার নিকট মানুষের রক্ত ও সম্পদ নিরাপত্তা পায়।' (বুখারী : ৬১১৯) অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে বলা হয়েছে হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। সামাজিক শান্তি রক্ষার্থে পারস্পরিক সমঝোতা, সদ্ভাব ও সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা উঁচু-নিচুর জাত-পাতের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে দিয়ে ইসলাম গেয়েছে সাম্যের গান। 'আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, নেই কালোর উপর সাদার প্রাধান্য। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কেবল তাকওয়া ও খোদাভীতি।' (মুসনাদে আহমদ : ২১৪০৭) আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার সীমাহীন তাগিদ তো পারস্পরিক শান্তি অক্ষুন্ন রাখারই মানসে। আর এর বিপরীতে রয়েছে কঠোর শাস্তির ঘোষণা! তাছাড়া হদ, কিসাস ও তা'যীরের খড়গ তো আপন তেজে সদা বর্তমান। ইসলামের বিজয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যেও কী পরিমাণ শান্তি ও নিরাপত্তার জোয়ার এসেছিল তা আমাদের ধারণারও অতীত। সুদূর হাযারামাওত থেকে অলংকার সজ্জিত এক যুবতী নারী একাকী উটের পিঠে মদীনা সফর করেছেন। পথে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয় তার মনে উদিত হয়নি। একবিংশ শতাব্দীর সভ্য দেশগুলোতে এর একটা নজীরও মিলবে কি?

**সম্প্রীতির অটুট বন্ধন**

মানুষ সামাজিক জীব। দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন তার জন্য অপরিহার্য। যাতে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে এবং বাড়াতে পারে সহযোগিতার হাত। এ উদ্দেশ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন- 'যে ব্যক্তি লোকজনের সাথে মিশে এবং তাদের কষ্ট সহ্য করে সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে লোকজনের সাথে মিশে না এবং তাদের কষ্টও বরদাশত করে না।' (ইবনে মাজাহ : ৪০৩২) বলা বাহুল্য যে, সমাজের সকল মানুষ একই গোত্রীভূত হবে না। তাদের মধ্যে ধর্ম, মত ও পথের অমিল থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজে সকল সদস্যের পারস্পরিক সম্প্রীতি একান্ত জরুরী। যে একাত্মতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির জনক ইসলাম সে একাত্মতার উন্মেষ ঘটিয়েছে মানবজাতির মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 'মানব জাতি এক জাতি বৈ ছিল না। তার পর তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।' (সূরা ইউনুস : ১৯) অন্য আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি কেবল একে অন্যে চিনে নেয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সবচাইতে বেশি সম্মানিত।' (সূরা হুজুরাত : ১৩)

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত জনতার উদ্দেশে এ আওয়াজই বুলন্দ করেছিলেন- 'সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি তোমাদেরকে মূর্খকালের অহংকার থেকে মুক্ত করেছেন। সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর আল্লাহ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।' (তিরমিযি : ৩২৭০) সুতরাং একই পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে গোটা মানব জাতি ভাই ভাই; কেউ কারো পর নয়। সে জন্য এ পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে একই পরিবারভুক্ত ভাই ভাই হয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে সৌহার্দ্য বজায় রেখে। দেখুন পারস্পরিক সম্প্রীতির গুরুত্ব সম্বলিত কুরআনের বাণী-

'স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। তারপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের অন্তরসমূহে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তারই নেয়ামত স্বরূপ তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের মুখপ্রান্তে; তিনি তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩) 'মুমিন প্রীতির পাত্র, যে ভালবাসে না এবং যাকে ভালবাসা হয় না সে কল্যাণ বঞ্চিত।' (মুসনাদে আহমদ : ২২৮৪০) প্রতিবেশীই মুহাব্বতের প্রথম প্রয়োগস্থল। এ জন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৎসামান্য বস্তু হলেও প্রতিবেশীকে হাদিয়া পাঠাতে উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- 'হে মুসলিম রমণীরা! কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীর কোন বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। তা ছাগলের একটি খুর হোক না কেন।' (বুখারী : ৬০১৭) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, 'ঝোল পাকালে বেশী করে পানি দাও এবং তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নাও।' (মুসলিম : ১৪২-২৬২৫) 'সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, দয়া ও মহানুভবতায় মুমিন বান্দারা এক দেহতুল্য। যখন কোন অঙ্গ ব্যথাক্রান্ত হয়, গোটা দেহ তার সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়ে।' (মুসলিম : ৬৬-২৫৮৬) মুমিন বান্দাদের পারস্পরিক সম্প্রীতির অবস্থাটি উক্ত হাদীসে দারুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি প্রতিবেশীর সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। ইরশাদ হচ্ছে- 'আল্লাহর নিকট ঐ প্রতিবেশী সর্বোত্তম যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বোত্তম।' (তিরমিযি) ইসলামের বদৌলতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির যে ঢেউ খেলেছিল, ইতিহাসে তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এক বকরির মাথা সাত ঘর ঘুরে আবার প্রথম জনের

নিকট ফিরে আসা অত্যাশ্চার্য নয় কি? সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ও জান্নাতী পরিবেশ যেন বিঘ্নিত না হয় তার জন্য প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীন ব্যক্তির কঠোর নিন্দা করেছে ইসলাম। এমনকি তার ঈমান সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- 'শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দা নিজের জন্য পছন্দসই বস্তু তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করা পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না।' (মুসলিম : ৭২-৪৫) 'আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়, কসম আল্লাহর! সে মুমিন নয়, খোদার কসম! সে মুমিন নয়। বলা হল, কে সে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।' (বুখারী : ৫৬৭০) 'যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী থাকে অভুক্ত, সে মুমিন নয়।' (বায়হাকী : ১৯৪৫২) সম্প্রীতির এ ঢেউ মুমিনের আঙ্গিনাতে থেমে থাকেনি, আছড়ে পড়েছে অমুসলিমেরও দুয়ারে। নিজ ঘরে বকরি জবাইয়ের সংবাদ শ্রবণে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের উদ্বেগ কাতর স্বর– আমাদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীর গৃহে তোমরা পাঠিয়েছ কি? তোমরা কি আমাদের প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে হাদিয়া দিয়েছো? (তিরমিযি : ২০০৭)

পাশ্চাত্যবাদীরা অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলে মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। বিশ্ব স্রষ্টার বিধান বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। আর এ কারণেই সংখ্যালঘুদের সাথে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যসুলভ সহাবস্থান বজায় রাখার জন্য উৎসাহ, পুরস্কার ও তিরস্কার সব ধরণের ব্যবস্থাই করেছে ইসলাম। কুরআনের বাণী- 'দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ ইনসাফগারদের ভালবাসেন।' (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৬০) সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তা দিয়ে ইসলামের ঘোষণা, 'জিম্মিদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই (হারাম), তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই (হারাম)।' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাইলফলক 'মদীনা সনদ' আজও বিশ্বের বিস্ময়। কাজেই ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলে চিহ্নিত করে ইসলামের সম্প্রীতি অস্বীকারের অপচেষ্টা চক্ষুষ্মানের অন্ধ সাজারই নামান্তর।

**আকাশ ছোঁয়া উদারতা**

ক্লান্ত বিধ্বস্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। রক্তে রঞ্জিত সারা দেহ। পিচ্ছিল রক্ত শুকিয়ে পায়ে আটকে গেছে জুতো। খুলতে পারছেন না। এমন সময় ফেরেশতাদের সর্দার জিবরাঈল (আ.) অনুমতি চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি চাইলে দু'দিকের পাহাড় চাপা দিয়ে বদ্‌বখত তায়েফবাসীর দফা-রফা করে দেই! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে তখন উদারতার বাণী- 'ওরা বুঝে না, ওদের অনাগত খান্দান হয়তো বুঝবে।' আশ্চর্য এমন বেহাল অবস্থায়ও বদ-দোয়ার লেশমাত্র নেই মুখে।

উহুদের ময়দান। শিরস্ত্রাণের দু'দুটো কড়া ভেঙ্গে চোয়ালে ঢুকে গেছে। সেই তায়েফের পুনরাবৃত্তি! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের পবিত্র রক্ত টপটপ করে ঝরছে। কী ব্যথা, কী বেদনা সে খেয়াল নেই দোজাহানের সর্দারের। প্রাণের শত্রুটর বরবাদীর আশঙ্কায় ব্যস্ত হাতে রক্ত সামলাচ্ছেন তিনি। তাঁর ভয়, না জানি অন্যায়ভাবে নবীর খুন মাটিতে ঝরে, আর মহাক্রুদ্ধ কাহ্হারের ক্রোধাগ্নিতে ধ্বংস হয় কুফ্ফারে কুরাইশ। কী আকাশ ছোঁয়া উদারতা!

মুনাফেককুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। যার দু'মুখো নীতির কারণে পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসলাম। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সেই উবাইয়ের কাফনে আমরা স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত কাপড়টি দেখতে পাই। এ যেন 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা কর' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)- এর বাস্তব নমুনা। খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশ্রণ, পাথর চাপা দিয়ে হত্যার প্রচেষ্টা, জাদুটোনার মাধ্যমে দীর্ঘ ছয় মাস অসুস্থতা ভোগসহ মদীনার ইয়াহুদী মুনাফেক চক্র কর্তৃক নবীজীকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার সকল ষড়যন্ত্র স্থান পেয়েছে ক্ষমা ও উদারতার নববী দস্তরখানে। তলোয়ারে নয়; উদারতার মন্ত্রবলেই ইসলাম জয় করেছেন মানব হৃদয়।

এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে ঋণ নিয়েছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সে ইয়াহুদী সাহাবায়ে কেরামের ভর মজলিসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার গেরেবান চেপে ধরে বলল, মুহাম্মাদ! তোমাদের বংশের ধারাই এমন। ঋণ তো নাও কিন্তু পরিশোধ করতে টালবাহানা কর। লৌহমানব উমর ফারূক (রা.) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইয়াহুদীকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু নবীজী তখন শান্ত ও স্থিরতার মূর্ত প্রতিক। বললেন, 'উমর! তার তো তাগাদা দেয়ার অধিকার আছে। তুমি আমাকে তার পাওনা আদায় করতে বলতে, আর তাকে উপদেশ দিতে নম্রতা অবলম্বনের! যাও, তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও এবং রূঢ় আচরণের কারণে কিছুটা বেশী দিয়ে দাও।'

এ প্রসঙ্গে সেই অতিথির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে, যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে শিশুদের খাবারসহ ঘরের সমুদয় আহার্য একাই ভক্ষণ করেছিল। রাতে পেটের পীড়ায় প্রকৃতির ডাকে সে বিছানা নষ্ট করে ফেলল এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই পলায়ন করল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না; বরং তার ফেলে যাওয়া তলোয়ার বিনয়ের সাথে তাকে ফেরত দিলেন। উপরোক্ত উভয় ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে ইয়াহুদীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের উদারতার এমন হাজারও ঘটনা সমৃদ্ধ করেছে ইতিহাসের সোনালী পাতাগুলো।

মক্কার দুর্বল ইসলাম নয়, মদীনার অপরাজেয় ইসলাম যখন কায় খসরুর রাজ দরবারে আঘাত হানতে শুরু করল, তখনও অবাক বিস্ময়ে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করল ইসলামের উদারতা। সেদিন জন্মভূমি মক্কার পুনরুদ্ধারে ইসলামের অনুসারীদের দয়ার তলোয়ার প্রতিশোধের রক্তে রঞ্জিত হয়নি। ওয়াহশী, হিন্দা আর ইকরামা বিন আবু জাহালের মতো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরাও শুধু ইসলামের বদৌলতে উদারতার নিরাপদ চাদরে আশ্রয় পেয়েছিল। আরব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতির মুখে 'তোমাদের তরে কোন অভিযোগ নেই' এর শাশ্বত বাণী। কাবার চাবিরক্ষক সেই উসমান যে

হিজরতের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে নবীজীকে কাবাগৃহে প্রবেশ করতে দেয়নি, কাবার চাবি কিনা সেই উসমানকেই অর্পণ করা হয়েছিল সেদিন চিরকালের জন্য। শুধু নবী যুগেই নয়, খেলাফতে রাশেদসহ সর্বকালেই ইসলামের উদারতায় মুগ্ধ ছিল বিশ্ববাসী। '৫৮৩ হিজরী সনের ২৭ রজব মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে সুদীর্ঘ ৯০ বছর পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। এ সময় সুলতান সর্বসমক্ষে যে সদাশয়তা, উদারতা ও ইসলামী আখলাক চরিত্র প্রদর্শন করেন তা একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের লেখনীতে–

'জেরুজালেম মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করার মুহূর্তে সালাহুদ্দীনের অধীনস্থ সৈনিক ও দায়িত্বশীল অফিসারবর্গ শহরের অলিগলির শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তারা ছিলেন যে কোন জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ। ফলে সে মুহূর্তে কোন খ্রিস্টানকেই কোনরূপ দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। মুক্তিপণ পরিশোধ করেছে এমন প্রত্যেক নাগরিককে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সুলতানের নির্দেশে অলিগলিতে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল– যে সমস্ত বৃদ্ধের মুক্তিপণ পরিশোধের সামর্থ নেই তারাও মুক্ত; তারা যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। এ ঘোষণার পর বাবুল বা'যার হতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আযাদকৃত লোকেরা দলে দলে বের হতে থাকে। শুধু তাই নয়, সুলতানের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার জন্য পথ্যস্বরূপ বরফ ও ফল-ফলাদি প্রেরণ করেন।

অথচ ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম বিজয়ের পর গডফ্রে ট্যাংকার্ড যখন সেখানকার গলি-ঘুপচিগুলো অতিক্রম করছিল তখন মুসলমানদের ওপর কি জুলুমই না তারা করেছিল। চতুর্দিকে শত শত লাশ পড়ে ছিল এবং আহতদের কাতর আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। এমতাবস্থায় ক্রুসেডাররা ঐসব নিরপরাধ মুসলমানদের ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিল। এবং জীবিত লোকদের পুড়িয়ে মেরেছিল।'

পাশ্চাত্যের বন্ধুরা! তোমরা টুইন টাওয়ার ধসানোর অভিযোগে শাস্তিস্বরূপ আফগান ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করলে। তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার নেক নিয়তে ইরাককে করলে বধ্যভূমি। তোমাদের ইঙ্গিতেই মধ্যপ্রাচ্যে আজ ইসরাইলের বিষফোঁড়া। গুজরাট, কাশ্মীর, আরাকান, মিন্দানাওয়ের মুসলিম নিধনে তোমাদেরই কালো হাত। আমরা তো এর বদলা নিতে তোমাদের আমেরিকায় অভিযান ঘোষণা করিনি। ইংল্যান্ড-বৃটেন অভিমুখেও ছোটেনি আমাদের একখানা বোমারু বিমান। বরং তোমাদের পন্যসামগ্রী ক্রয় করে অর্থের যোগান দিয়ে, আমাদের বিমান ঘাঁটি দিয়ে সর্বোপরি আমাদের সেনাবাহিনী ব্যবহার করে সন্ত্রাসী(?) নিধনে উদারতার পরিচয় দিচ্ছি। 'হুজুরের মত চমৎকার! হুজুরের মতে অমত কার' জিগির তুলে, মৌলবাদ নিপাত যাক বলে আল্ট্রা মডারেট মুসলিম দেশের খেতাব কুড়াতে মাথা কুটে মরছি। তবু কি আমরা নন-মডারেটই থেকে যাব। উদারপন্থীর সনদখানা কি আমাদের কপালে জুটবে না কোন দিন?

**সহিষ্ণুতা**

সহনশীলতা, মানুষের মহৎ গুণ। সহনশীতার কাঁধে ভর করে মানুষ পৌঁছুতে পারে অভীষ্ট লক্ষ্যে। পরম সহিষ্ণুতাকে কুরআন 'আযমিল উমূর' বা দৃঢ়সংকল্প করে নামকরণ করেছে। কুরআনের বাণী- '(নিপীড়িত হয়েও) যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তা তো হবে দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ।' (সূরা শুরা : ৪৩) অসহিষ্ণুতা ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্য ক্রোধ দমনের সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ- 'যে ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, বস্তুত আল্লাহ অনুগ্রহশীলদের ভালবাসেন।' (সূরা নিসা : ১৩৪) হাদিসের বাণী- 'কুস্তিতে পরাভূতকারী (প্রকৃত) বাহাদুর নয়, বাহাদুর তো সেই যে ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করে।' (বুখারী : ৫৭৬৩) সহিষ্ণুতার প্রশংসা ও পুরষ্কার ছড়িয়ে আছে কুরআনের পাতায় পাতায় 'আল্লাহ তা'আলা সহিষ্ণুদের ভালবাসেন। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা : ১৫৩) '(প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই তো উত্তম।' (সূরা নাহল : ১২৬)

হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি তখনও স্বাক্ষরিত হয়নি। আবু জান্দাল নামক এক সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের নিকট এলেন। তার সারা গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন। হাতে-পায়ে লৌহশৃংখল। মক্কার কাফেররা তাকে ফেরত নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। নবীজী তাদেরকে যুক্তি দেখালেন, 'অস্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের অঙ্গীকার মানায় বাধ্যবাধকতা নেই।' কিন্তু তারা বেঁকে বসল। কিছুতেই ছাড়বে না আবু জান্দালকে। শেষ পর্যন্ত নবীজী তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন আবু জান্দালকে। কিন্তু তাদের অনড়তায় শুধুমাত্র শান্তির স্বার্থে মজলুম সাহাবীর সকাতর মিনতি 'আমি মুসলমান হয়ে কী নিদারুণ দুঃখ-যাতনা ভোগ করে এখানে এসেছি। এখন আমাকে আবার ফেরত পাঠানো হচ্ছে' সত্ত্বেও তাদের উদ্ভট ও অযৌক্তিক দাবী মেনে নিলেন। রেখে গেলেন আবু জান্দালকে। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেই উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদে নবীজীর হাতে আমরণ সংগ্রামের শপথ নেয়া ১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কী অপূর্ব সহিষ্ণুতা, ধৈর্যের কী চরম পরাকাষ্ঠা। (বুখারী : ২৫৫৩, ফাতহুল বারী)

হযরতের কন্যা যয়নবকে স্রেফ ইসলামের সাথে বিদ্বেষবশত বর্শাঘাতে উঁটের পিঠ হতে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় তার গর্ভপাতসহ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছিল। কিন্তু নীরবে সয়ে গেলেন দয়াল নবী। (খামীস)

বেলাল হাবশী, আবুজর গিফারী, আম্মার, ইয়াসার, সুমাইয়া, খাব্বাব ইবনে আরতসহ নাম জানা-অজানা কত অসংখ্য সাহাবী ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অনলে দগ্ধ হয়েছেন তার হিসাব কে রেখেছে কোন্ দিন। তাছাড়া রক্ত ভেজা তায়েফ তো তোমাদেরকে প্রতিনিয়ত সহিষ্ণুতারই সবক শেখায়।

'সয় যে রয় সে'– একথা পরম সত্য। ইতিহাস তো তাই বলে। কোথায় আজ সেসব মুনাফেক দাম্ভিকেরা! যারা বলেছিল, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবলেরা অবশ্যই দুর্বলদের (মুসলমানদের) বহিষ্কার করব। (সূরা মুনাফিকুন : ৮) অথচ ওহীর মাধ্যমে তাদের এ উদ্ধত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত হওয়ার পর এবং প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সৈনিকেরা সহিষ্ণুতার অভয় পতাকা উড়িয়েছিলেন। ওদের পরিণতি ইতিহাসের আঁস্তাকুড়, এদের পরিণাম মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখর। ওরা পলীদ, ভাগাড়ের মাটি, এরা স্বর্ণ; সহিষ্ণুতার অনলে দগ্ধ নিখাদ খাঁটি।

দান করা ভালো কিন্তু নিজেকে পথে বসিয়ে নয়। নিজেকে বিবস্ত্র করে অন্যের লজ্জা ঢাকাও ভালো কথা নয়। এজন্যই সম্প্রীতি ও উদারতার ক্ষেত্রে সীমার বাঁধন রয়েছে ইসলামের। উদারতার পরিচয় দিতে গিয়ে যদি ইসলামকেই বিকৃত করা হয়, সম্প্রীতির বাঁধন আঁটতে গিয়ে ইসলামের গ্রন্থিতেই যদি ঢিল পড়ে এবং জলাঞ্জলি দেয়া হয় ধর্মীয় অনুভূতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচার তাহলে সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। কেননা 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য অবৈধ ও হারাম'।

মূলত পরস্পরে অহিংস মনোভাব বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম পালনে ব্যাপৃত থাকলে, মানবিক প্রয়োজনে একে অপরকে মন উজাড় করে সহযোগিতা করলে এবং কেউ কারো ধর্ম-কর্মে হস্তক্ষেপ না করলেই সাম্প্রদায়িক উদারতার প্রমাণ মেলে। মণ্ডপ, মন্দির দৌড়ে কিংবা বড়দিনের অনুষ্ঠানে সশরীরে হাজিরা দিয়ে উদারতা প্রদর্শনের কোশেশ নিষ্প্রয়োজন। ইসলাম আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সুতরাং ছাড়াছাড়ি কিংবা বাড়াবাড়ি নয়, বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

**শেষ কথা**

সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীরা যখন সন্ত্রাসের ভিত্তিহীন বানোয়াট অভিযোগ মুসলিম উম্মাহর নবজাগরণের প্রাণসংহারে লিপ্ত, তখন উপসংহারের আঁচড় টানা যুক্তিসঙ্গত কিনা সে তর্কে যাচ্ছি না। তবে উপযুক্ত আলোচনার নিরিখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সন্ত্রাস নয়, শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরম সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম। যদি তাই না হবে তাহলে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য হামযার (রা.) হন্তারকের গর্দান থেকে প্রতিশোধের খঞ্জর অপসারণ করে কে তার নিরাপত্তার জামিন হয়েছিল? কে কেড়ে নিয়েছিল দুর্ধর্ষ উমরের খুন পিয়াসী তলোয়ার? প্রতিবেশী ইয়াহুদীর ঘরে খাবার পৌঁছানোর জন্য উদ্বিগ্ন হতে কে বাধ্য করেছিল আব্দুল্লাহ আবনে উমর (রা.)-কে? 'যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়', 'অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর', 'জিম্মির রক্ত মুসলমানেরই রক্ত, তার সম্পদ মুসলমানেরই সম্পদ (এর মতোই হারাম)', 'ধর্ম গ্রহণে জবরদস্তি নেই' কোন ধর্মের বাণী? কার তাগিদে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী (রা.)-এর দায়েরকৃত মামলায় যথাযথ প্রমাণের অভাবে অন্যায় দাবিদার ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিয়েছিল ইনসাফী আদালত? সর্বোপরি অসভ্য, বর্বর, অন্ধকার আরবকে সর্ববিধ পাপাচার থেকে কে নিরস্ত করেছিল? কে দেখিয়েছিল প্রকৃত সভ্যতার আলো ঝলমলে পথ? ইসলাম নয় কি? আর এসব কি ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরম সহিষ্ণুতার ঘোষণা করে না? বস্তুত ছাই চাপা পড়ে নিষ্প্রভ হওয়ার বস্তু আর যাই হোক ইসলাম নয়।

'ওরা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভাতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।' অপবাদের নেকাব ছিঁড়েফুঁড়ে সত্য উদ্ভাসিত হবেই। এটাই নিয়ম, এটাই চিরন্তন। তবে সতর্ক থাকতে হবে ইসলামের অনুসারীদের। ইসলামের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে ওলামায়ে কেরামসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে। আর আক্ষেপ এখানেই। কবির ভাষায়–

'ঘূর্ণিবায়ু তিমির নিশি তুফান তোলা ঢেউ,
দুলিতেছে তরী নোঙর ছিঁড়ে, ঘুমিয়ে মাঝি সেও।'

অতএব, সতর্কতা কাম্য। তবেই শান্তি-সম্প্রীতি, উদারতা ও পরম সহিষ্ণুতার পতাকাবাহী ইসলামের বিজয়।

# ক্রুসেড বিজয়ী বীর! আর কত খুনের নাযরানায় তুমি ফিরে আসবে?

**মাকসূদুর রহমান**

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন সব মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল মহাকালের বিস্তৃত পথে যারা পথিকের আলোকবর্তিকার মর্যাদা লাভ করেছে। তাদের জীবন চলন ছিল নির্মোহতা ও ধার্মিকতার পথে। নৈতিক পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদিতা ছিল তাদের জীবনের অলংকার। জনপদ ও সমাজের নেতৃত্বের জন্য তাদের কাছে ছিল আল্লাহ প্রদত্ত সেই চির সমুজ্জ্বল আলো যা জীবনের সকল পথ ও পথের বাঁক আলোকিত করে রেখেছিল। তাই পূর্ণ রেযা ও সন্তোষের মুহূর্তে কিংবা শত্রুতা ও বিদ্বেষের চূড়ান্ত মানবীয় দুর্বলতার সময়ও ন্যায় ও সুবিচার থেকে তারা তিল পরিমাণ বিচ্যুত হতেন না। চির কল্যাণ ও মানব উন্নয়ন ছিল তাদের অবগাহন ক্ষেত্র। তাই তাদের জীবন-পরিক্রমা হতো যেমন সুন্দর মৃত্যুর দৃশ্যপট হতো আরো সুন্দর।

২৭ সফর ৫৮৯ হিজরী ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. রোগাক্রান্ত হবার একাদশ দিবস। এ দিন তার অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করে। জামে' কাল্লাসার ইমাম শাইখ আবূ জা'ফরকে (যিনি খুবই নেককার বুযুর্গ লোক ছিলেন) সুলতানের মুমূর্ষাবস্থা দেখে দুর্গের ভিতর রাত কাটাবার অনুরোধ করা হয়। তিনদিন আগ থেকেই সুলতানের মধ্যে স্মৃতিবিভ্রম ও বেহুঁশী অবস্থা চলছিল। শাইখ আবূ জাফর রাতভর তার কাছে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি هو الله الذى لا اله ... الغيب والشهادة পর্যন্ত পৌঁছলেন সুলতান শেষবারের মত হুঁশ ফিরে পান এবং যবান থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে وهو كذلك صحيح "এমনটাই তো বাস্তব"। পরমুহূর্তটি ছিল আরো বিস্ময়কর। তেলাওয়াত চলছিল لا اله الا هو عليه توكلت। সুলতানের চেহারায় হাসির রেখা ফুটে উঠলো, আলোকময় অবয়বে উজ্জ্বল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। -*আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* ১৩/৩, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ১৫/৪৪০।

তার জীবনের শুরুটা ছিল ভোগ-বিলাস আর আনন্দ বিনোদনের। শূরাপান তার নেশায় পরিণত হয়েছিল। -*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ১৫/৪৩৬। কিন্তু শাসন ক্ষমতা হাতে আসার পর তার জীবনপট সম্পূর্ণই পাল্টে যায়। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী তাকে আপন করে নেন। তার সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করেন, চাপা পড়া যোগ্যতার বিকাশ ঘটান। নূরুদ্দীনই তাকে জোর করে মিশর ভূমিতে পাঠান।

কাযী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ বলেন, আমাকে সালাহুদ্দীন নিজেই বলেছেন, "নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতকটা বাধ্য হয়েই আমি মিশর ভূমিতে আসি। আমার মর্জি মাফিক আমি মিশরে আসিনি।"

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন, দেশের (মিশরের) শাসন ক্ষমতার বাগডোর হাতে আসার পর তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়া গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। মদ্যপান থেকে তিনি তওবা করেন এবং বিলাসী জীবন যাপন ও খেলাধুলা থেকে মুখ ফিরিয়ে একজন সংযত ও পরিশ্রমী মানুষের জীবন এখতিয়ার করেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন বলতেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে মিশর ভূমি দান করেছেন তখন আমি মনে করি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডও তিনি আমাকে দান করবেন। হিত্তিনের বিজয়ের পর সুলতানের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ধরা দিল। ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকদিস বিজয়ের মাধ্যমে ৯২ বছরের ব্যকুল ক্ষণের সমাপ্তি ঘটল। ২৭ রজব ৫৮৩ হিজরীর এ মহান বিজয় সুলতান সালাহুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সুলতান একদিকে ছিলেন আত্মিক ও সমর শক্তি এবং নীতি ও রাজনীতির সমন্বিত সত্তার অধিকারী। অপরদিকে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য মুসলিম শাসকগোষ্ঠি থেকে বিলুপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তার সমাবেশকারী।

**গুণ-বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনা**

ইমাম যাহাবী বলেন, وكان مهتما في بناء سور بيت المقدس وحفر خندقه يتولى ذلك بنفسه ينقل الحجارة على عاتقه ... "তিনি বাইতুল মাকদিসের প্রাচীর নির্মাণ এবং পরিখা খননের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। এ কাজ তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে করান। এ সময় দিনভর তিনি পাথর বহনের কাজ আঞ্জাম দেন।" এত সুবিস্তৃত অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা সুলতানকে আত্মত্যাগ ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এতটুকু বাঁধা সৃষ্টি করেনি। কারণ তিনি তো ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদার জীবন্ত ছবি।

সুলতানের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ছিল অবিশ্বাস্য। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইবনে কাসির বলেন, হিত্তিনের বিজয়ের পর সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে তাবু স্থাপন করেন। বন্দি শাসকদেরকে তার দরবারে উপস্থিত করা হয়। সুলতান বন্দি খ্রিস্টান সম্রাটকে তার পাশেই বসান। মজলিসে কর্কের শাসনকর্তা রেজিনাল্ডকেও আনা হয়। সুলতান সম্রাটকে পিপাসার্ত দেখে ঠাণ্ডা সুমিষ্ট পানি এগিয়ে দেন। সম্রাট পানীয় পান করে কর্কের শাসনকর্তার দিকে পাত্র বাড়িয়ে দেন। এতে সুলতান সম্রাটের উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি তাকে পানপাত্র দেইনি, আপনি দিয়েছেন। সুতরাং এ ঘটনায় তার জন্য শাস্তি মওকুফের কোন পয়গাম নেই। (তাদের সমাজে কাউকে নিরাপত্তা প্রদানের একটি পদ্ধতি ছিল সম্মান প্রদর্শন)। সুলতান কর্কের শাসনকর্তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। সে অস্বীকার করলে সুলতান বলেন, نعم انا انوب عن رسول الله في الانتصار لامته "হ্যাঁ! আমি উম্মতের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেআদবীর প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" অতপর সুলতান নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন।

ইতিপূর্বে কর্কের শাসনকর্তা মক্কা-মদীনায় হামলা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল এবং এক হজ্ব কাফেলার সামনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী মূলক কথা উচ্চারণ করেছিল। তারই শাস্তি স্বরূপ সুলতান তাকে হত্যা করেন। আর খ্রিস্টান সম্রাটকে সসম্মানে দেশে পাঠিয়ে দেন। -*আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* ১২/৩৪৮।

আল্লামা আলী মিয়াঁ নদবী রহ. তাঁর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, সুলতান গাজী সালাহুদ্দীন যেমন ছিলেন অতি উচ্চ প্রশাসনিক যোগ্যতা ও দুর্লভ নেতৃত্বগুণের অধিকারী শাসক তেমনি

মানুষ হিসেবে ছিলেন সততা, ধার্মিকতা, আভিজাত্য, মহানুভবতা ও মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এত অসংখ্য মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ আল্লাহ তার মধ্যে ঘটিয়েছিলেন যা বিশ্ব ইতিহাসের বিরল ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শুধু ঘটে। বস্তুত তিনি ছিলেন ইসলামের অসংখ্য অলৌকিকতার একটি এবং এ কথার প্রমাণ যে, বিশ্বের মানবমঞ্চে ইসলামের ভূমিকা এখনো শেষ হয়ে যায়নি এবং মুসলিম উম্মাহ তার প্রাণশক্তি ও উৎপাদনশীলতা এখনো হারিয়ে ফেলেনি।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন-

وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في الجماعة، يقال إنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل، حتى ولا في مرض موته، كان يدخل الامام فيصلي به، فكان يتجشم القيام مع ضعفه

"তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামা'আতের সাথে আদায় করতেন। তার ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘদিন তার জামা'আত ছুটেনি। এমনকি মৃত্যুশয্যায়ও না। (মৃত্যুশয্যায়) ইমাম সাহেব তার দূর্গে প্রবেশ করতেন। সুলতান সালাহুদ্দীন কষ্ট করে হলেও দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতেন।" -*আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* ১৩/৬।

ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে আসীর বলেন, সুলতানের দানশীলতা ছিল বিস্ময়কর। মৃত্যুকালে তার রেখে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পদই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। -*আলকামেল* ১০/২২৪।

আল্লামা ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন, তিনি একটি মাত্র দীনার এবং ৪৭টি দিরহাম রেখে যান। এছাড়া কোন জমিজমা, বসতবাড়ী, ক্ষেত-খামার কোন কিছুই তিনি রেখে যাননি। এমনকি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সম্ভব হয়নি। বরং তার সুহৃদ বন্ধু কাযী ফাযেল নিজের হালাল কামাই থেকে কাফনের ব্যবস্থা করেন। -*আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* ১৩/৫।

সুলতান সালাহুদ্দীন তার প্রতিভা ও যোগ্যতার মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ডে সুন্দর সুপরিণত ও সুসমৃদ্ধ সমাজ, সভ্যতা ও শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সাথে সাথে অমুসলিমদের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা, বন্দিদের সাথে সদাচরণ এবং বিভিন্ন দয়া-অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে চির ঋণে আবদ্ধ করেছিলেন।

তার মৃত্যু নিছক একটি জাতি ও জনগোষ্ঠির শোকসন্তাপে মূর্ছে যাওয়ার কারণ ছিল না; বরং মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য এক মহা বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করেছিল। ইমাম যাহাবী জামে কাল্লাসার ইমাম শাইখ আবূ জাফর থেকে বর্ণনা করেন-

وارتفعت الأصوات بالبكاء وعظم الضجيج حتى أن العاقل كان يتخيل أن الدنيا تضج صوتا واحدا وتأسف الناس عليه حتى الفرنج

"তার জানাযার পর কান্নার আওয়াজ উচ্চকিত হতে লাগল। ক্রন্দনরোলে হুলস্থুল অবস্থা সৃষ্টি হলো। মনে হচ্ছিল পুরা দুনিয়া একই সুরে শোক পালন করছে। মুসলমান, ইউরোপিয়ান নির্বিশেষে সকলেই মূর্ছে পড়েছিল। -*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ১৫/৪৪০।

এতকাল এতযুগ পরেও যেন সে অশ্রুপাতের ধারা চলছেই। মানুষের প্রতীক্ষার চোখ খুঁজে ফিরছে নতুন যুগের সালাহুদ্দীনকে। মুসলিম নিধনের মহোৎসব রুখে দিবে কোন সে ব্যক্তি? খুনরাঙ্গা ইতিহাসের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সন্ধান দিবে কে সে বীর? মুসলমানদের প্রথম কেবলা উদ্ধারের স্বপ্ন কি চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে? কোথায় আজ সালাহুদ্দীন-জননীরা? উম্মাহকে একজন সালাহুদ্দীন উপহার দিতে তাদের আর কত খুনের নজরানা প্রয়োজন?

# আশ্বস্ত হোন, আপনাকে ঠকানো হয়নি

**জালিস মাহমূদ**

ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখেন এমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, নারীর উপযোগী অধিকার প্রদানে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে অগ্রসর। একমাত্র মুসলিম জাতি ব্যতীত পৃথিবীর কোনো জাতিই এখন পর্যন্ত নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারেনি। ইসলামে নারীকে লাঞ্ছনা-অপদস্তার নিম্নতর স্তর থেকে তুলে এনে 'ঘরের রাণী'র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অর্থ-সম্পদের অধিকারে নারী যেখানে ছিল 'অচ্ছুৎতুল্য' সেখানে ইসলাম সযত্নে তার হতে তুলে দিয়েছে সম্পদের মালিকানা ও উপার্জনের অধিকার। 'রক্ষিতা'র নাপাক বিশেষণ থেকে পবিত্র করে এমনকি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবেও তার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। এক কথায় ইসলাম নারীকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রাপ্য সম্মানের সবটুকু দিয়েছে, যেখানে অন্যান্য ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠী তাদের মর্যাদা ও অধিকার দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবহেলা ও অবজ্ঞা করেছে। এ কারণেই নারী জাতির প্রতি ইসলামের সমতাপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আজও ইউরোপের নারীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সেকেলে (!) ইসলামের 'মধ্যযুগীয়' বিপ- বের তরঙ্গদোলা এখনো নাড়া দেয় পশ্চিমা নারীদের।

ইসলামের দৃষ্টিতে নর-নারী, আরব-অনারব, সাদা-কালো নির্বিশেষে সব মানুষই সমান। নর বা নারী হওয়া, আরব কিংবা অনারব হওয়া, সাদা অথবা কালো হওয়া ইসলামে কোনো বিশেষ মর্যাদা বা অমর্যাদার মানদণ্ড নয়। আল কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন, 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি...' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭০) এই আয়াতে আদম সন্তানের মধ্য থেকে মর্যাদার সাথে পুরুষ বা নারীকে বিশেষায়িত করা হয়নি। বরং ব্যাপকভাবে আদম সন্তানকে মর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল, পুরুষ-নারী সমান মর্যাদার অধিকারী। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, 'দীনদারী ও তাকওয়া ছাড়া কারো উপর কারো বিশেষ মর্যাদা নেই।' (মুসনাদে আহমদ: ৪/১৫৮ হা.নং ১৭৪৮২) অর্থাৎ মানুষমাত্র সবাই সমান। পুরুষের পুরুষত্বের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই আর নারীর নারীত্বের কোনো অমর্যাদা নেই। মর্যাদা অমর্যাদা বিবেচিত হবে তাকওয়ার দ্বারা। একজন মুত্তাকী পরহেজগার মহিলা হাজারো বদকার পুরুষের চেয়ে উত্তম। আবার একজন মুত্তাকী পুরুষ হাজারো বদকার মহিলা থেকে উত্তম।

সৃষ্টিগত মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষ-মহিলা উভয়ে সমান। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করে, আর মহিলাকে অমর্যাদার পাত্র করে সৃষ্টি করেননি। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে মানব সম্প্রদায়! (পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে) তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর এবং আত্মীয়তাকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।' (সূরা নিসা: ১)

নারী-পুরুষের সৃষ্টি দু'জন নর-নারীর সংমিশ্রণের ফলেই হয়েছে। অতএব, নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই। এদিকে ইংগিত করে ইরশাদ হচ্ছে: 'হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে...' (সূরা হুজরাত: ১৩)

এই আয়াতে মূলত নারী পুরুষের মধ্যে মর্যাদার দেয়াল দাঁড় করাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে বলেছেন, 'আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা হলো পরস্পর একে অপরের সহযোগী...' (সূরা তাওবা: ৭১) অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পরস্পরে যেমন অন্যের তুলনায় নিজেকে মর্যাদাশীল মনে করে না, ঠিক তেমনি নারী-পুরুষ একে অন্যের তুলনায় নিজেকে মর্যাদাশীল মনে করবে না, আয়াতে সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবে যেমন পুরুষ নারীর উপর বিশেষ কোনো মর্যাদা রাখে না, তেমনিভাবে শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষ উভয়ে সমমর্যাদার অধিকারী। পুরুষ নেক কাজ করলে যেমন ছাওয়াব ও পুরস্কারের উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়, তেমনি নারীও নেক কাজ করলে সেও পুরুষের মতই ছাওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হয়। নারী বলে তাকে ছাওয়াব দেয়া হবে না বা কম দেয়া হবে এমন কোনো কথা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করে এবং সে মুমিন হয় তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা সামান্য পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।' (সূরা নিসা: ১২৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, 'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।' (সূরা নাহল: ৯৭)

ইসলাম ছাওয়াব ও পুরস্কারের ক্ষেত্রে নর-নারীকে যেমন সমান মর্যাদা দিয়েছে, নারী হওয়ার অপরাধে নারীর ছাওয়াব কমিয়ে দেয়া হয়নি, ঠিক তেমন অপরাধের দণ্ডের ক্ষেত্রেও পুরুষ ও নারীর মাঝে সমতা রক্ষা করেছে। নারী হওয়ার অপরাধে নারীর দণ্ড বাড়িয়ে দেয়নি। বরং ক্ষেত্রবিশেষে কমিয়ে দিয়েছে।

আলকুরআন ঘোষণা দিচ্ছে, 'আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তোমরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদের হাত কেটে ফেলো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।' (সূরা মায়েদা: ৩৮) ব্যভিচারের দণ্ডের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'ব্যাভিচারিনী এবং ব্যাভিচারী উভয়কে একশত বেত্রাঘাত কর।' (সূরা নূর: ২)

ইসলামে পুরুষ যেমন সম্পদের মালিক হতে পারে এবং সে নিজের সম্পদ বৈধ যে কোনো খাতে ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে, ঠিক তেমনি নারীকেও সম্পদের

মালিক হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং নারীকেও নিজের মালিকানাধীন সম্পদ বৈধ যে কোনো খাতে ইচ্ছামত খরচ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা এমন কিছুর আকাঙ্খা করো না যার দ্বারা আল্লাহ একের উপর অন্যকে গৌরাবান্বিত করেছেন। পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীগণ যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ আছে...' (সূরা নিসা: ৩২) এ সূরারই অন্য আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে, 'পুরুষের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে-অল্প বা অধিক, নির্দিষ্ট পরিমাণ।' (সূরা নিসা: ৭)

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল, মুসলিম নারী মুসলিম পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। নারীকে নারী হওয়ার কারণে কোনো অংশে খাঁটো করা হয়নি। আর পুরুষকে পুরুষ হওয়ার কারণে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন সন্তান থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক এগিয়ে রাখা হয়েছে। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী হা.নং ৫৬২৬)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, অতঃপর সে তাকে কষ্ট না দেয়, তার উপর অসন্তুষ্ট না হয় এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর প্রাধান্যও না দেয়, তাহলে ঐ কন্যার কারণে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।' (মুসনাদে আহমাদ: ১/২২৩)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যদি তিনটি কন্যা থাকে অথবা তিনটি বোন থাকে, আর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে (তাদের সবধরণের প্রয়োজন খুশি মনে পুরা করে) তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে তিরমিযী হা.নং ১৯১২)

হযরত আনাস রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত দু'টি মেয়েকে লালন-পালন করল ও শিক্ষা-দীক্ষা দিলো, সে কিয়ামাতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এ রকম হব। এ বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন।' (সহীহ মুসলিম হা.নং ২৬৩১)

উল্লেখ্য, কোনো হাদীসে পুত্র সন্তান লালন পালনের বিশেষ কোনো ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অথচ কন্যা সন্তান লালন পালনের কত বড় বড় ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই এসব হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে।

**কিছু সন্দেহ ও তার নিরসন**

**১.** অনেকের ধারণা, 'ইসলাম নারীকে নেতৃত্বের অধিকার না দিয়ে তাঁকে খাঁটো করেছে এবং পুরুষের তুলনায় নারীকে ছোট করা হয়েছে।'

মূল উত্তরের আগে একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, কেউ নির্দিষ্ট মডেলের একটি গাড়ি ক্রয় করল। কোম্পানির পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো, গাড়ীটি খুব দুর্বল, ইঞ্জিন ও বডি শক্তিশালী নয়, এই গাড়ি পিচঢালা মসৃণ রাস্তায় চলার উপযোগী, এটা নিয়ে দূরপাল্লার সফরে বের হবেন না, উঁচু-নিচু ও ভাঙ্গা রাস্তায় চালাবেন না। যদি এই নিয়ম মেনে চলেন, তাহলে অনেক দিন এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর নিয়ম না মানলে যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। বুদ্ধিমান ক্রেতা কোম্পানির নিয়ম মেনে গাড়িটি চালাবে এটাই স্বাভাবিক। কোম্পানি যেহেতু গাড়িটি তৈরি করেছে, তাই কোম্পানি এই গাড়ির স্বভাব-চরিত্র ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব, খোদ কোম্পানির পক্ষ থেকে এটার সাথে বিশেষ কোনো আচরণ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তা না মেনে নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এটাকে ব্যবহার করা জুলুম বৈ কিছু নয়।

ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলার সৃষ্টিকর্তা। পুরুষ-মহিলার মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি কোনো পার্থক্য না করলেও সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ ও মহিলার মাঝে বেশ পার্থক্য করেছেন। শারীরিকভাবে পুরুষদেরকে যতটা শক্তিশালী করেছেন, মহিলাদেরকে তেমন শক্তিশালী করেননি। পুরুষের দেহ, মন, চরিত্র-স্বভাব সব কিছুই মহিলার দেহ, মন, চরিত্র-স্বভাব থেকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। এই বৈচিত্রের কারণেরই পুরুষ আক্রমণত্মক হয়ে থাকে, আর মহিলা রক্ষণাত্মক ভূমিকায় থাকে, পুরুষ হাজারো নারীর মধ্যে একাকী চলতে কোনো ভয়-ডর অনুভব করে না, কিন্তু নির্জন জায়গায় দু'চারজন পুরুষের কাছে মহিলা নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না। এ পার্থক্যগুলি এমন যা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন সব মানুষই মানতে বাধ্য। সৃষ্টিগত এই পার্থক্যের কারণেই আল্লাহ তা'আলা নেতৃত্ব ও রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পুরুষের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। কারণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা জানেন, নারীর কোমল দেহ ও কোমল মন রাজ্য পরিচালনার মত কঠিন দায়িত্ব আনজাম দেয়ার উপযোগী না। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নারীর উপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে এই কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা না বুঝে নারীর জন্য যা উপযোগী নয় তাই নারীকে করতে বাধ্য করছি। এটা আমাদের অজ্ঞতা-মূর্খতা ও গোড়ামি ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর আইন এবং রুল ভঙ্গ করার কারণে আমরা প্রত্যাশিত শান্তি, শৃঙখলা ও উন্নতি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি।

**২.** সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও নারীকে কোনো অংশে খাঁটো করা হয়নি কিংবা নারীকে কোনো অংশে কম দেয়া হয়নি। চিন্তা করলে সহজেই উপলদ্ধি করা যাবে যে, মহিলাদেরকে পুরুষ থেকে বেশিই দেয়া হয়েছে। বেশি না হলেও সমান সমান তো বটেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জীবনের কোনো পর্যায়ে মহিলাদের উপর নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার পিতার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। বিবাহের সময়ে স্বামীর কাছ থেকে নির্ধারিত মহল অতঃপর তার সব ধরণের খরচের দায়িত্ব স্বামীকে দেয়া হয়েছে। স্বামী বিয়োগের পর তার ভরণ-পোষণ পুত্র সন্তানদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। দেখা গেল, কন্যা, বধূ, মা জীবনের

এই তিনটি পর্যায়ের কোনো পর্যায়ে নারীর জীবনধারণ সংক্রান্ত খরচের দায়িত্ব নারীর উপর দেয়া হয়নি। আর পুরুষেরা এর উল্টো, পুত্র সন্তান বালেগ হওয়ার পর পিতার উপর তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়। বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার নিজের খরচ, স্ত্রীর খরচ, সন্তানদের খরচ এবং পিতা-মাতার খরচ তাকে বহন করতে হয়। মোটকথা পুরুষের খরচের খাত অনেক। পক্ষান্তরে মহিলার খরচের কোনো খাত নেই, তা সত্ত্বেও তাকে পিতার সম্পদ থেকে পুত্র সন্তানের অর্ধেক দেয়া হচ্ছে। এর দ্বারা কি তাকে ঠকানো হলো, নাকি তাকে এক ধরণের বেশিই দেয়া হলো। মনে করুন, কাউকে এক হাজার টাকা দিয়ে বলা হল, এই টাকার মালিক তুমি। তবে এই টাকা দিয়ে তোমাকে অমুক অমুক সদাই কিনতে হবে। ফলে তার এক হাজার টাকার সবটাই খরচ হয়ে গেল। আর অন্য একজনকে পাঁচশত টাকা দিয়ে বলা হল, এটা তোমার। তুমি যেভাবে খুশি এটা খরচ করতে পারো। ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে, যাকে পাঁচশত টাকা দেয়া হয়েছে তাকে কম দেয়া হয়েছে একথা বলা যায় না। কারণ, তাকে কোন কর্তব্য পালনের জন্য এ টাকা দেয়া হয়নি। নারী পুরুষের ব্যাপারটিও এমনই। মহিলাকে অর্ধেক দেয়া হয়েছে কিন্তু তাকে কোনো খরচের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আর পুরুষকে বেশি দেয়া হয়েছে কিন্তু তার উপর বহু ধরণের খরচের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় এ কথা বলতে পারি যে, সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে কোনো অংশে খাটো করেনি। বরং পুরুষের সমান সম্পদই তাকে দেয়া হয়েছে।

**৩.** ব্যবসায়িক ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে দুইজন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যর সমান বলা হয়েছে। এর পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যথা: যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের দায়িত্ব দেননি, তাই তার স্বভাব-প্রকৃতি ব্যবসা-বাণিজ্যে ও লেন-দেনের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়নি। এজন্য ব্যবসায়িক বিষয়াদি ও লেন-দেন সে পুরুষের মত ভালো করে মনে রাখতে পারবে না; বরং ভুলে যাওয়ার এবং ভুল করার প্রচণ্ড আশংকা থেকে যায়। এজন্য মহিলাকে সাক্ষী রাখলে দুইজন মহিলাকে রাখতে হবে। এর কারণ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেন একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।' বোঝা গেল সাধারণ কর্মক্ষেত্র না হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে ভুল করা মহিলাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আর সাক্ষ্যর ক্ষেত্রে ভুল হলে যেহেতু ফেতনা-ফাসাদ হতে পারে, তাই যদি মহিলাকে সাক্ষী রাখতেই হয়, তাহলে দুইজন মাহিলাকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এখানে মহিলাকে খাঁটো করা হয়নি বরং এই হুকুমের মাধ্যমে তার উপর সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ, তাকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচানোর জন্যই এই হুকুম দেয়া হয়েছে।

**৪.** এমনিভাবে হত্যা মামলায় সাক্ষ্য প্রদান থেকে মহিলাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে শুধু এই জন্য যে, মহিলার স্বভাব-তবিয়ত মারামারি-কাটাকাটি, সংঘাত, সংঘর্ষ, রক্ত, ধ্বংসযজ্ঞ এসব সহ্য করতে পারে না। তাই সে ঠিক মনে রাখতে পারবে না যে, কার ছুরি আর কার গুলির আঘাতে কে মারা গেল। তার সামনে ঘটে যাওয়া খুনের ঘটনার খুনিকেও হয়তো কিছুক্ষণ পরে সে স্মৃতিপট থেকে হারিয়ে ফেলবে; কারণ, রক্তের প্রথম ফোটা দেখেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। ফলে ভুলে অন্য কারো কথা বলে দিতে পারে। শুধু এজন্যই খুনের ঘটনায় মহিলাদেরকে সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রকৃতি নারীর পুরো উল্টো। তাই এসব ক্ষেত্রে পুরুষের সাক্ষ্যই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, নারীর মর্যাদা কমিয়ে দেয়া হয়েছে; বরং এখানেও নারীর স্বভাব-প্রকৃতিকে বিবেচনায় রেখে তার উপর সহানুভূতি করা হয়েছে।

**৫.** ভুলবশত কোনো নারীকে হত্যা করে ফেললে পুরুষের অর্ধেক রক্তপণ দিতে বলা হয়েছে। এতে কেউ মনে করতে পারে যে, এখানেও নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হলো। এর জবাব হল, পরিবারের সমস্ত খরচ যোগানোর দায়িত্ব থাকে পুরুষের উপর। তাই কোনো পরিবারের একজন পুরুষ মারা গেলে ঐ পরিবার আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ভুলবশত হত্যার শাস্তি স্বরূপ রক্তপণ (দিয়াত) নির্ধারণের একটা উদ্দেশ্য হল, ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারের ক্ষতি পুরণ করা। পরিবারের যাবতীয় খরচের যোগানদাতা পুরুষটির বিয়োগে পরিবার যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাধারণত একজন নারীর বিয়োগে পরিবার আর্থিকভাবে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আর রক্তপণের হুকুম যেহেতু ক্ষতিপুরণের জন্যেও তাই পুরুষের রক্তপণ নারীর দ্বিগুণ করা হয়েছে। এখানে নারীকে খাঁটো করা কোনে উদ্দেশ্য নয়।

**৬.** অনেকে আকীকার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে থাকে যে, ইসলাম এখানে পুরুষ মহিলার মাঝে পার্থক্য করেছে। পুরুষ সন্তান হলে দুইটি বকরী আকীকা করতে বলা হয়েছে, আর কন্যা সন্তান হলে একটি বকরি আকীকা করতে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্টতই পুরুষকে নারীর উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

আমরা বলবো, আকীকার উদ্দেশ্য যারা জানে না, কেবল তারাই এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। যারা আকীকার হাকীকত ও উদ্দেশ্য জানে তারা কখনো এ অবান্তর প্রশ্ন করবে না। সন্তানকে বিপদাপদ, বালা-মুসিবাত থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে আকীকা করা হয়ে থাকে। আকীকার পশু জবাই করার সময় যে বিশেষ দু'আ পড়া হয়, সে দু'আর মধ্যেই আকীকার এই উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। পুরুষরা যেহেতু জীবিকা অর্জনের তাগিদে অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে অরক্ষিত, বিপদ-শঙ্কুল পরিবেশে অবস্থান করে, তাই তার জীবনে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবতের আশংকা অনেক বেশি। মহিলাদের উপর যেহেতু জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব নেই তাই অধিকাংশ সময় তার অবস্থান সংরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান ঘরের মধ্যে হয়ে থাকে। ফলে তার জীবনে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবতের আশংকা পুরুষের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। যেহেতু আকীকার উদ্দেশ্যই হল বালা-মুসিবত থেকে সন্তানের হেফাযত কামনা করা আর মহিলার তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ বালা-মুসিবতের আশংকা রয়েছে তাই পুত্র সন্তানের জন্য দুইটি বকরী আকীকার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী আকীকার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য জানার পরও কি একথা বলা ঠিক হবে যে, আকীকার ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে? বাস্তবিক পক্ষে কর্তৃত্ব ও প্রতিযোগীতার প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ লড়াইয়ে

দুর্বল প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা ইনসাফ বহির্ভূত। সাম্য ও মানবতার পতাকাবাহী ইসলামে এ অন্যায় আচরণকে শুধু অগ্রাহ্য করা হয়নি; বরং প্রতিহত করা হয়েছে। অথচ সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার উপযুক্ত দায়িত্ব ও অধিকার।

# আলোকময় বিকেল

**সা'দ আরাফাত**

ঢাকা মুহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক সাতমসজিদ। দক্ষিণ দিকে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বেড়িবাঁধমুখী ব্যস্ততম বসিলা সড়ক। সাতমসজিদের অদূরে এই বসিলা সড়কের পাশেই ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) অবস্থান। পথিপার্শ্বে কারখানা আকৃতির একসারি টিনশেড ভবন। বাইরের চিত্র সাদামাটা হলেও তা'লীম-তরবিয়ত অর্থাৎ শিক্ষা, দীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই জামি'আর অবস্থান সমীহ জাগানোর মতো। নিয়মতান্ত্রিক লেখা-পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী।

গত ৩০ যিলহজ্ব '৩৪ হিজরী (৫ নভেম্বর '১৩ ইং) মঙ্গলবার গিয়েছিলাম জামি'আ রাহমানিয়ায়। আসর নামাযের পূর্বে উপস্থিত হলাম জামি'আর নামায-ঘরে। বৃহদাকার নামায-ঘরটি তখন তালিবে ইলমে কানায় কানায় পূর্ণ। নামায শেষে জামি'আর তালিবে ইলমগণ অর্ধচন্দ্রাকারে রুমের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসলেন। তিলাওয়াতের মাধ্যমে মজলিস শুরু হল। একজন তালিবে ইলম হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. প্রণীত "এক মিনিটের মাদরাসা" কিতাব থেকে তা'লীম করলেন। এরপর খতমে খাযেগান পড়ে মুসলিম উম্মাহ এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হলো। দোয়া শেষে তাশরীফ আনলেন এই মজলিসের মধ্যমণি জামি'আর মুহতামিম হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর) দা.বা.।

সপ্তাহের মঙ্গলবার জামি'আর নামায-ঘরে মুমিনপুরী হুযূরের (দা.বা.) ইসলাহী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। থানবী বাগানের সর্বশেষ ফুল মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদুয়ী রহ.-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও স্নেহধন্য খলীফা হযরত মুমিনপুরী হুযূর (দা.বা.)। সাদামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই সরল ব্যক্তিত্ব সুন্নাতে নববীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি সকলকে যেন চুম্বকের মতো আরো কাছে টেনে নিলো। হারদুয়ী হযরতের মালফুযাত-গ্রন্থ (বাণী সংকলন) "মাজালিসে আবরার" থেকে হযরত যখন এক একটি মালফুয পড়ছিলেন, মনে হচ্ছিল শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ হৃদয়গুলো যেন ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হচ্ছে। আরো মনে হচ্ছিল, একদিন সাকী তাঁর শাইখের কাছ থেকে লাভ করেছেন 'শারাবান তহুরা'। আর আজ তা পরম যত্নে অকৃত্রিম হৃদয়ে তৃষ্ণার্তদের তুলে ধরছেন। গভীর তন্ময়তায় নতুন ভাবের উন্মেষ ঘটালো কথাগুলো-

"কারো বাহ্যিক বেশভূষা ও পোশাক-আশাক যদি অসংলগ্ন ও ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে এটাকে সমাজ তার অভ্যন্তরীণ ত্রুটির দলীল-প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করে। বাহ্যিক ত্রুটি দেখে ফয়সালা করা হয় যে, তার অভ্যন্তরও ত্রুটিযুক্ত এবং সে মানসিক বিকারগ্রস্ত। পক্ষান্তরে যার বাহ্যিক বেশভূষা ও পোশাক-আশাক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও আদর্শের পরিপন্থী হয় তার ক্ষেত্রে একথা কেন বিশ্বাস করা হয় না যে, দীনের ক্ষেত্রে তার অন্তর এবং অভ্যন্তর ত্রুটিযুক্ত! তার বাহ্যিক বেশভূষা ও পোশাক-আশাকের ত্রুটি কি তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও ঈমানের ত্রুটির প্রমাণ নয়? সামাজিক বিচারে কারো বাহ্যিক আচরণে ত্রুটি দেখা দিলে তাকে তৎক্ষণাৎ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তেমনিভাবে দীনের ক্ষেত্রে কারো বেশভূষা এবং বাহ্যিক কার্যকলাপ শরীয়ত-পরিপন্থী হলে তাকেও দীন-ঈমানের চিকিৎসক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

এভাবে দু' তিনটি মালফুয পড়ার পর হযরত কিছু অমূল্য নসীহত পেশ করলেন। বললেন- "যে যতো বড় আলেমই হোক কিংবা শাইখুত তাফসীর বা শাইখুল হাদীসই হোক অথবা বড় মুফতীই হোক- এর দ্বারা তার মানুষ হওয়া নিশ্চিত হয় না। মানুষ হতে হলে কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সোহবতে নিজেকে হাওয়ালা করতে হবে। সুন্নাতের পাবন্দ কোনো বুযুর্গের তত্ত্বাবধানে দীন ও ঈমান-আমল শিখতে হবে এবং অন্তরের মন্দ স্বভাবগুলো দূর করে যাবতীয় সদগুণের অধিকারী হতে হবে। তাহলেই মানুষ হওয়া যাবে, তাহলেই দীনের কিছু অংশ ভিতরে আসবে।"

গোটা মজলিসেই হযরত এমন সংক্ষিপ্ত অনেক অমূল্য কথা বলেছেন, যেগুলো জীবনের গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশের ভূমিকা রাখে। অনুভব হলো, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য থেকে পাওয়া কিংবা অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জরুরী দিকনির্দেশনা দিলেন।

মজলিস সম্পর্কে জামি'আর দাওরায়ে হাদীসের কয়েকজন তালিবে ইলমের মূল্যায়ন জানতে চাইলে তারা উচ্ছ্বসিত অনুভূতি প্রকাশ করেন। তারা বলেন, মঙ্গলবারের এই মজলিস পুরোটাই মঙ্গলময়। এই মজলিসের মাধ্যমে উত্তরোত্তর শ্রোতাদের আখলাকী এবং রূহানী উন্নতি হচ্ছে। কখনো আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি অর্জনের উদ্যমে ভাটা পড়লে হযরতের দিক নির্দেশনা থেকে পুনরায় আমল শুরু করার উদ্যম লাভ হচ্ছে। আর তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি ঈমানী ও ইলমী পুঁজিও তাদের এই মজলিস থেকে হাসিল হচ্ছে।

সপ্তাহের এই একটি দিন, থানবী বাগানের হারদুয়ী গোলাপ থেকে আহরিত সুরভি বিতরণ করেন ঋদ্ধ ও আলোকিত ব্যক্তিত্ব হযরত মুমিনপুরী হুযূর (দা.বা.)। সেই সুরভি লাভ করে জীবনটাকে সুরভিত করার মানসে প্রয়াসী কিছু অন্তর। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের অবস্থা শুনে এবং হারদুয়ী হযরতের সোহবতধন্য মুমিনপুরী হুযূরের সান্নিধ্য লাভ করে ফিরে পায় নতুন প্রত্যয়, নব প্রেরণা। সেই টানেই সপ্তাহজুড়ে এই দিনের প্রতীক্ষা থাকে সবার মাঝে।

গ্রন্থ পরিচিতি

# তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন

মাওলানা শফীকুর রহমান

**লেখক পরিচিতি**

উর্দূ ভাষায় মা'আরিফুল কুরআন নামে ৮ খণ্ডের দু'টি তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। একটির সংকলক শাইখুত তাফসীর আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী রহ.। অপরটির সংকলক পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মুহাম্মদ শফী রহ.। আমাদের আলোচনা এ দ্বিতীয় তাফসীর গ্রন্থটি নিয়ে।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত উপমহাদেশের দীনী ইলমের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দে তাঁর জন্ম। পিতা মুহাম্মদ ইয়াসীন রহ. ছিলেন হাফেযে কুরআন, প্রসিদ্ধ আলেমে দীন এবং দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম যুগের মহান বুযুর্গদের প্রতিচ্ছবি। পিতার কাছেই তিনি উর্দূ, ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। তারপর দারুল উলূম দেওবন্দে বিশ্ববরেণ্য আলেমগণের নিকট উলূমে নববীর উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, বিখ্যাত ফকীহ হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান ও শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. প্রমুখ আলেমগণ ছিলেন তাঁর দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দেই শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি দুই মেয়াদে (১৩৫০ হি. - ১৩৫৪ হি. এবং ১৩৫৯ হি. ১৩৬১ হি.) দীর্ঘ আট বছর প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন। আত্মশুদ্ধিতে চরম উৎকর্ষ সাধন করে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হন। উম্মাহর কল্যাণসংশি- ষ্ট সকল ব্যাপারে তাঁর ছিল অনুভূতিশীল একটি হৃদয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। আলোচ্য তাফসীর গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন অনেক অনবদ্য গ্রন্থ। আহকামুল কুরআন, ইমদাদুল মুফতীন, জাওয়াহিরুল ফিকহ তাঁর রচনাবলীর অন্যতম।

উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এই মনীষী ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

**মা'আরিফুল কুরআনের সংকলন:**

স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেওবন্দ হতে পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে করাচীর আরামবাগের নিকটস্থ বাবুস সালাম মসজিদে কুরআনে কারীমের দরস প্রদান শুরু করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রেডিও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ মা'আরিফুল কুরআন নামে একটি ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের উদ্যোগ নেয়। এর জন্য তারা হযরত মুফতী সাহেবকে নির্বাচন করেন। হযরত প্রথমে রাজী ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অব্যাহত পীড়াপীড়িতে শর্ত সাপেক্ষে রাজী হন। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে ৩রা শাওয়াল ১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক ২রা জুলাই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মা'আরিফুল কুরআন নামে এই কথিকার কাজ শুরু হয়। কথিকাগুলো ছিল উম্মাহর সমসাময়িক জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত আয়াত-বিশেষের তাফসীর ও ব্যাখ্যা। ধারাবাহিক এ কথিকাগুলো এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশ-বিদেশের জনসাধারণের পক্ষ হতে ক্রমাগত পত্র আসতে থাকে। এই কথিকা ধারাবাহিক ১০ বছর প্রচারিত হয়। এ সময় কুরআনে কারীমের ১২ পারা পর্যন্ত নির্বাচিত আয়াতসমূহের তাফসীর সমাপ্ত হয়। তারপর এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য জনসাধারণের সাথে যোগ হয় বিশিষ্টজনদের আবদার আবেদন। তিনি ভাবলেন, রেডিওতে তাফসীর করার সুবাদে যখন ১২ পারার তাফসীর লেখা হয়ে গেছে এখন হিম্মত করে বাকী অংশ লেখার কাজেও হাত দেয়া যায়। সে মতে তিনি কাজ শুরু করে দেন এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে ২১ শা'বান ১৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা সমাপ্ত হয়।

**রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী:**

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে মা'আরিফুল কুরআন সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকৃত। অসাধারণ এ গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রের মূল উৎসসমূহের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা, উদ্ধৃতি ও পর্যালোচনা সমৃদ্ধ। এতে আছে যুগ জিজ্ঞাসার যুক্তিগ্রাহ্য চমৎকার সব জবাব। এছাড়া হাদীস, ফিকহ, তাসাওউফসহ দীনী ইলমের সকল বিষয় এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। আট খণ্ডে সমাপ্ত প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার এ তাফসীর গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পবিত্র কুরআনের মর্মকথা সর্বশ্রেণীর পাঠকের বোধগম্য করে তুলতে এতে আভিধানিক বিশে- ষণ, ব্যাকরণিক বিন্যাস ও অলংকার শাস্ত্রের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম আলোচনাসহ জটিল বিষয়াদি পরিহার করা হয়েছে এবং অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

তাফসীরের মূলনীতি অনুযায়ী মৌলিক তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের তাফসীর-গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে, যা সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে বিদ্যমান। পাশাপাশি প্রায় প্রতিটির উদ্ধৃতিও উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী নির্ভরযোগ্য তাফসীর-গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে অনেক শিক্ষনীয় ও কল্যাণকর বিষয়। এক্ষেত্রে ঐ সকল বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে যা মানুষের হৃদয়ে কুরআনে কারীম, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মর্যাদাবোধ ও ভক্তি-ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপনে ও আত্মশুদ্ধির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

আয়াতের তরজমা নেয়া হয়েছে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ও শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান গঙ্গুহী রহ. কৃত উপমহাদেশে সর্বজন স্বীকৃত তরজমা হতে। ক্ষেত্র বিশেষে অন্যদের তরজমা হতেও সাহায্য নেয়া হয়েছে। আর বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশে- ষণ করা হয়েছে নির্ভরযোগ্য অভিধান ও প্রামাণ্য তাফসীর-গ্রন্থের সাহায্যে।

তরজমার পর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশে- ষণের পূর্বে আয়াতের সার-সংক্ষেপ এত সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে যে, সেটাই এক সংক্ষিপ্ত তাফসীরের রূপ নিয়েছে। এতে লাভ

হয়েছে এই যে, ব্যস্ত মানুষ শুধু এটুকু দেখে নিলেও আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবে।

আহকাম সম্বলিত আয়াতগুলোর অধীনে শরীয়তের বিধি-বিধানগুলো অত্যন্ত সহজ সরল ও সুবিন্যস্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এর বেশির ভাগই গ্রহণ করা হয়েছে তাফসীরে কুরতুবী, ইমাম জাস্সাস কৃত আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী কৃত আহকামুল কুরআন, তাফসীরে আহমদী, আলবাহরুল মুহীত, রূহুল মা'আনী, রূহুল বয়ান ও বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি গ্রন্থাবলী থেকে। এক্ষেত্রে কদাচিৎ তিনি নিজস্ব গবেষণা ও মন্তব্যও সতর্কতার সাথে তুলে ধরেছেন।

সমসাময়িক ও আধুনিক মাসআলাগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যত্নের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং যুগের সকল ফেতনা ও ফেরকা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।

**মা'আরিফুল কুরআনের অনুবাদঃ**

আল্লাহ তা'আলা এই তাফসীর-গ্রন্থকে কল্পনাতীত মকবুলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। হাজী সাহেবানদের খিদমতে কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্ত তরজমা-তাফসীর বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে সৌদি সরকার বাংলাভাষী হাজীদের মাঝে বিতরণের জন্য মা'আরিফুল কুরআনকে কিছু সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এ কাজের জন্য মনোনীত করা হয় প্রথিতযশা সাহিত্যিক পূর্ণ মা'আরিফুল কুরআনের অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবকে। তিনি মাত্র এক মাসে বিনা পারিশ্রমিকে এ মহান কাজ আঞ্জাম দানে সক্ষম হন। সৌদি সরকার পূর্ণ গ্রন্থটি এক ভলিউমে উন্নত কাগজে লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে বাংলা ভাষাভাষী হাজী সাহেবানদের মাঝে বিতরণ করেন। অপরদিকে ঢাকাস্থ সৌদী দুতাবাসের মাধ্যমেও বাংলাদেশের জনগণের মাঝে হাজার হাজার কপি বিতরণ করা হয়।

পরবর্তীতে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবেরটিও পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেছে, যা মূল তাফসীরের ন্যায় আট খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে এবং সর্ব মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন, প্রফেসর হাসান আসকারী ও প্রফেসর মুহাম্মদ শামীম। সম্পাদনা করেছেন হযরতের কনিষ্ঠ পুত্র বর্তমান বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষক, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা.বা.। প্রকাশিত হয়েছে করাচী হতে।

উল্লেখ্য, এই তাফসীর-গ্রন্থে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার বেশির ভাগ সহীহ, হাসান মানের হলেও কিছু সংখ্যক যয়ীফ, মুনকার রেওয়ায়েতও এতে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের জানামতে কিতাবটির হাদীসের মান চিহ্নিত কোন সংস্করণ এখনো বাজারে আসেনি। কোন গবেষক আলেম কিংবা কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ খেদমতটি আঞ্জাম দিলে উম্মাহর বহু কল্যাণ সাধিত হত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

# ফাতাওয়া মাসাইল

**ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭**

### আকাইদ

**০১. প্রশ্ন:** একজন মুসলমান কোনো হিন্দুকে যদি হাতজোড় করে নমস্কার করে এতে কি তার ঈমানের ক্ষতি হবে?

**উত্তর:** মুসলমানের জন্য এমন কোনো কাজ বা আচরণ করা ঠিক নয় যা অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোনো কাজে বা আচরণে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের দলভুক্ত হবে।' অতএব, অন্য ধর্মের কোনো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা গুনাহের কাজ। আর নমষ্কার যেহেতু হিন্দুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাই কোনো হিন্দুকে হাতজোড় করে নমষ্কার করা জায়েয নেই। এটা ঈমানের জন্যেও ক্ষতিকর। যদিও এর দ্বারা কুফুরের সিদ্ধান্ত দেয়া হবে না। এতদ সত্ত্বেও এই কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। (আবূ দাউদ হা.নং ৪০৩১, কানযুল উম্মাল হা.নং ২৪৬৮০)

**০২. প্রশ্ন:** শেষ যামানায় ৭৩ দলের মধ্যে একদল জান্নাতী হবে। জান্নাতী সেই দলের বৈশিষ্ট্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানাবেন। বর্তমানে জান্নাতী সেই একটি দল কোন দল এবং তাদের বৈশিষ্ট কী? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানাবেন।

**উত্তর:** হাদীসে এসেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইহুদীরা ৭১/৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। এমনিভাবে খ্রিস্টানরাও বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মতও ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একদল ব্যতীত সকলে জাহান্নামে যাবে। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দল কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা হলো ঐ দল যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের অনুসারী হবে।' এই হাদীসে জান্নাতী সেই একটি দলের পরিচয়ে বলা হয়েছে 'যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের অনুসারী হবে' অর্থাৎ যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসরণ করবে। আর পরিভাষায় তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলা হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য হক্কানী আলেম কর্তৃক লেখা আকীদা সম্পর্কিত কিতাব পড়তে হবে। যেমন, মুফতী মনসূরুল হক কৃত *কিতাবুল ঈমান*, মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেবে কৃত *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* পড়া যেতে পারে।

আর জান্নাতী সেই দল অতীতে যেমন ছিল এখনও আছে এবং কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সবসময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদেরকে কোনো শক্তিই সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।' তাদের অস্তিত্ব কখনো বড় দল আকারে থাকবে, আবার কখনো ছোট দল আকারেও থাকতে পারে। দলটির পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করার মত ক্ষমতা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু এ দলটি কখনোই সম্পূর্ণ মিটে যাবে না।

বর্তমানে এ দলের লোক দীনী মাদরাসায়, দাওয়াতের মারকাযে, হক্কানী পীরদের খানকায় এবং হক্কানী উলামাদের সঠিক অনুসারীদের মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। (সূরা আনআম: ১৫২, তিরমিযী হা.নং ২৬৪, ২৬৪১, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৩৫)

### ত্বহারাত

**০৩. প্রশ্ন:** একজন লোক দাড়িতে লাল আঠালো জাতীয় জিনিষ দ্বারা কলব করলো এবং এর দ্বারা দাড়ির উপর পাতলা আবরণ পড়ল, এতে তার উযূ হবে কিনা?

**উত্তর:** আমাদের জানামতে খেযাবে কোনো ধরনের আবরণ পড়ে না। তাই খেযাব ব্যবহার করলেও উযূ-গোসলের সময় দাড়িতে পানি পৌঁছে এবং উযূ-গোসল সহীহ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, আপনি যে খেযাবের কথা বলেছেন, তাতে যদি বাস্তবেই আবরণ পড়ে থাকে, তাহলে এই খেযাব ব্যবহারের পর আবরণ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত উযূ-গোসল সহীহ হবে না। আর একেবারে কালো খেযাব পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার: ১/১৫৪, নিযামুল ফাতাওয়া: ১/৩৫৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/২১৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া: ৬/২৯১)

**০৪. প্রশ্ন:** আমার ছোট ভাই ক্যান্সারের রোগী। অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকে। গোসল করলেই তার রোগ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তার যদি ফরয গোসলের প্রয়োজন পড়ে তাহলে সে কি করবে?

**উত্তর:** যদি কেউ এমন অসুস্থ হয় যে, উযূ বা গোসল করার দ্বারা তার রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। (রদ্দুল মুহতার: ১/২৩২, আলবাহরুর রায়েক: ১/২৪৫, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ২/৪৮)

### নামায

**০৫. প্রশ্ন:** ডাক্তার কোন বিশেষ রোগের রুগীর চিকিৎসার জন্য যখন তাকে ইনজেকশন দেয়, তখন কোনো কোনো রুগী বেহুশ অবস্থায় এক দুইদিন পড়ে থাকে। অনেক রুগী এই অবস্থায় মারাও যায়। কেউ বা সুস্থও হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই অজ্ঞান অবস্থায় তার উপর দিয়ে যে সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময় তার উপর শরয়ী আহকাম যথা নামায, রোযা জুম'আ, ঈদ ইত্যাদির হুকুম আরোপ হবে কিনা? যদি হয় তাহলে পরে সেইগুলির কাযা করতে হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর:** কোনো বিজ্ঞ ডাক্তার যদি কোনো রুগীকে অপারেশন ইত্যাদির জন্য ইনজেকশন বা কোনভাবে বেহুশ করে এক্ষেত্রে এরূপ অসুস্থ ও অজ্ঞান ব্যক্তির উপর শরিয়তের আহকাম যথা নামায রোযা ইত্যাদি আরোপ হওয়ার বিধান হলো, যদি একাধারে একদিন একরাত অর্থাৎ ছয় ওয়াক্তের নামায অজ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ ব্যক্তির নামায মাফ এবং পরবর্তীতে সুস্থ হলেও তা কাযা করা ওয়াজিব না।

আর যদি একদিন একরাত থেকে কম সময় অর্থাৎ চার বা পাঁচ ওয়াক্তের নামায অজ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে পরে সুস্থ হয়ে যায়, এক্ষেত্রে তার নামায মাফ হবে না।বরং জ্ঞান আসার পর তা কাযা করে নেয়া তার উপর ওয়াজিব। হ্যাঁ, যদি অজ্ঞান করার পর পুনরায়

আর জ্ঞান না ফিরে, অজ্ঞান অবস্থায়ই মারা যায় তাহলে এ অবস্থায় যে কয় ওয়াক্ত নামায অতিবাহিত হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মাফ বলে গণ্য হবে।

তবে রমযান মাসের দুই একদিন বা তার চেয়েও বেশি সময় অজ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত হলে জ্ঞান ফিরার পর সেই রোযাগুলো পরবর্তীতে কাযা করে নেয়া জরুরী। আর যদি অজ্ঞান অবস্থায়ই মারা যায় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মাফ বলে গণ্য হবে।

وقضى ايام اغمائه ولوكان الاغماء مستغرقا للشهر لندرة امتداده سوى يوم حدث الاغماء فيه او فى ليلته فلا يقضيه الا اذا علم انه لم ينوه... الدر المختار٤١٧/٣ زكريا

ومن اغمى عليه خمس صلوات قضى ولو اكثر لا يقضى... فتاوى هندية: ٢٧٠/١

(আদ্দুররুল মুখতার: ৩/৪১৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২৭০, ২০৭, আলমুহীতুল বুরহানী: ১/১৩৭, মাসায়েলে নামায: পৃ. ২০৯)

**০৬. প্রশ্ন:** কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর নামাযরত অবস্থায় যদি তাকে চুম্বন করে, এর দ্বারা স্ত্রীর নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কিনা? এমনিভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে তার নামায পড়া অবস্থায় চুম্বন করে তাহলে স্বামীর নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কিনা?

**উত্তর:** স্ত্রীর নামাযরত অবস্থায় স্বামী যদি তাকে চুম্বন করে, তাহলে এর দ্বারা স্ত্রীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় স্ত্রীর নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। আর স্বামীর নামাযরত অবস্থায় স্ত্রী যদি তাকে চুম্বন করে এবং এতে স্বামীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর স্ত্রীর চুম্বনের কারণে যদি তার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার নামায ফাসেদ হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার: ১/৬২৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ১/১২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/১০৪)

## লেন-দেন

**০৭. প্রশ্ন:** সরকারী সঞ্চয়পত্রে সরকার নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মুনাফার হার পরিবর্তন করা হয়। আমার জানার বিষয় হলো, সরকারি সঞ্চয়পত্রে টাকা খাটানো এবং মুনাফা গ্রহণ করা জায়েয হবে কিনা?

**উত্তর:** সরকারী সঞ্চয়পত্রে টাকা খাটিয়ে মুনাফা গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের লেনদেন একটি বড় ধরণের গুনাহ। সুদের ভয়াবহতা ও এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে মুনাফা নিয়ে থাকলে তা হারাম হয়েছে। এই গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। এবং মুনাফা বাবদ যত টাকা নেয়া হয়েছে তা ছাওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীব মিসকীনদের মাঝে ছদকা করে দিতে হবে। আর ভবিষ্যতে এ খাতে টাকা খাটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। (সূরা বাকারা: ২৭৫, সহীহ মুসলিম ২/২৭, জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/২৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ৩/১১৭, রদ্দুল মুহতার: ২/২৯২, ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৩/৩০২)

**০৮. প্রশ্ন:** আমি ব্যাংকে তিন লক্ষ টাকা রেখেছি। এতে ৪৫ হাজার টাকা সূদ এসেছে। একজন মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, সুদের টাকা ব্যাংক থেকে কোন নিয়ম এখতিয়ার করলে হালালভাবে উঠানো যায়? তিনি বললেন, আপনি ব্যাংক থেকে দুই লক্ষ টাকা উঠান, আর বাকী এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক লক্ষ ৪৫ হাজার টাকায় যে ডলার পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ডলার উঠাবেন। তাহলে, অতিরিক্ত অংশ জায়েয হয়ে যাবে। কারণ, টাকা আর ডলারের মাঝে কম-বেশি করা জায়েয আছে। যেমন সোনা আর রূপার মাঝে কম-বেশি করা জায়েয আছে।

**উত্তর:** ব্যাংকে গচ্ছিত তিন লক্ষ টাকার সুদ এসেছে ৪৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে দুই লক্ষ টাকা উঠিয়ে এক লক্ষ ৪৫ হাজারের বিনিময়ে তার সমপরিমাণ ডলার উঠানো আর সরাসরি এক লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা উঠানোর মধ্যে বিন্দু মাত্র পার্থক্য নেই। কারণ সুদী টাকাকে অন্য জিনিসের মাধ্যমে পরিবর্তন করে নিলে তা হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং এক লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার বিনিময়ে তার সমপরিমাণ ডলার নেয়ার মধ্যে এক লক্ষ টাকার ডলার হালাল আর সুদী ৪৫ হাজার টাকার সমপরিমাণ গৃহীত ডলার হারাম হবে।

পক্ষান্তরে টাকা ও ডলারের মাঝে কম-বেশি করা এবং সোনা রূপার মাঝে কম-বেশি করে লেন-দেন করা জায়েয হওয়ার প্রশ্ন তখনই হবে যখন এগুলোর মধ্যে উভয় লেন-দেনকারীর হালালভাবে স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর এখানে তো সুদের ৪৫ হাজার টাকাতে একাউন্ট হোল্ডারের কোনো মালিকানাই নাই। অতএব, টাকা ও ডলার, সোনা ও রুপার সাথে এই মুআমালাকে মিলানো কোনোভাবেই সহীহ নয়।

عن عطاء الخراسانى ان عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوبا اصغرها حوبا كمن اتى امه فى الاسلام... اخرجه عبد الرزاق فى المصنف: ١٠٤٦١

(সূরা আলে ইমরান: ১৩০, সূরা বাকারা: ২৭৮, সূরা নিসা: ১৬১, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ১০/৪৬১, ই'লাউস সুনান: ১৪/৫১২, রদ্দুল মুহতার: ৫/১৬৯, বাদয়েউস সানায়ে: ৬/৫১৮, আল বাহরুর রায়েক: ৬/২০৪, আল মুগনী: ৬/১১৬)

**০৯. প্রশ্ন:** আমি একটি হাউজিং প্রকল্পে অংশিদার হওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু টাকা বিনিয়োগ করি। লভ্যাংশের ব্যাপারে বলেছিল যে, অন্যান্য শরীকরা যে অনুপাতে লাভ নিবে আমাকেও সে অনুপাতে দেয়া হবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল, উদ্যোক্তাগণ আমার ন্যায় অংশীদারদেরকে লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়াই বিনিয়োগকৃত অর্থের ২০% হিসাব করে লাভ দিয়ে দেয়। যার অংশ-বিশেষ আমিও গ্রহণ করি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন জানতে পারলাম যে, এভাবে লাভ দেয়া সুদ দেয়ার শামিল তখন সুদ থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে নিম্নোক্ত সূরতটি কল্পনা করছি। আমি সুদের বাকি অংশ গ্রহণ করবো না, যা গ্রহণ করেছি তাও ফেরত দিয়ে দিব। এর বিপরীতে তাদেরকে প্রস্তাব করবো যে, ১৯৯৮ (যে বছর আমি বিনিয়োগ করেছি) সনে যে হারে তারা জমি ক্রয় করেছে সেই মূল্যে আমার বিনিয়োগকৃত অর্থে যে পরিমাণ জমি উক্ত প্রকল্পে পাওয়া যায়, সে পরিমাণ জমি সেই দরে যেন আমার নিকট বিক্রয় করে। জানার বিষয় হলো, উক্ত প্রস্তাবে যদি তারা রাজি হয়ে যায়, তাহলে আমার জন্য এভাবে জামি ক্রয় করা জায়িয হবে কিনা?

**উত্তর:** অর্থ বিনিয়োগ ও শরীকী ব্যবসা সহীহ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, শ্রমদাতা ও বিনিয়োগকারীর লভ্যাংশের হার স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে নেয়া। যেমন, যা লাভ হবে তার দুই তৃতীয়াংশ কোম্পানীর আর এক তৃতীয়াংশ বিনিয়োগকারীর। আর লোকসান হলে প্রত্যেক বিনিয়োগকারী পুঁজি অনুপাতে লোকসানের হারও গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। শুরুতেই যদি লভ্যাংশ নির্ধারিত না হয় কিংবা কোনো পক্ষের

জন্য নির্দিষ্ট অংক যেমন শতকরা বিশ টাকা বা ত্রিশ টাকা ইত্যাদি, অথবা পুঁজি অনুপাতে ক্ষতি বহনের দায়িত্ব না থাকে, তাহলে সে শরীকী ব্যবসা শরীয়ত মোতাবেক সহীহ হবে না। বরং তা সুদী কারবার বলে গণ্য হবে। যা সম্পূর্ণ হারাম।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত সূরতে আপনাদের শরীকী ব্যবসার টাকা বিনিয়োগের পূর্বেই লভ্যাংশের হার নির্ধারণ না হওয়ায় আপনাদের শরীকী ব্যবসা সহীহ হয়নি। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম হলো, মূলধন বা তার দ্বারা ক্রয়কৃত মাল টাকার মালিকগণ ফেরত পাবে। পরিশ্রমকারী তথা হাউজিং কর্তৃপক্ষ শ্রমের বিনিময়ে সাধারণ পারিশ্রমিক পাবে। অতএব, হাউজিং প্রকল্পে জমি ক্রয়ের জন্য আপনি যে টাকা দিয়ে ছিলেন, সে টাকায় ১৯৯৮ সালে যে জমি কেনা হয়েছে তা আপনারই থাকবে। শরীয়ত মোতাবেক সে জামির পাওনাদার মূলত আপনিই।

অবশ্য হাউজিং কর্তৃপক্ষ জমি ক্রয় করে সেখানে উন্নয়ন মূলক কিছু করে থাকলে, ক্রয় ও উন্নয়নের আনুপাতিক খরচ আপনার কাছ থেকে কেটে রাখতে পারবে। সুতরাং আপনি যে প্রস্তাব দেয়ার চিন্তা করেছেন সেটাই বর্তমান পরিস্থিতি হিসাবে শরীয়তেরও ফয়সালা। অতএব, প্রকল্প মালিকদের এটা মেনে নিয়ে সুদী কারবার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া একান্ত কর্তব্য।

قال فى شرح المجلة: بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط. فاذا بقى مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة لان الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد...

(শরহুল মাজাল্লাহ: ৪/২৬০, আদ্দুররুল মুখতার: ৫/৬৪৬, বাদায়েউস সানায়ে: ৫/১৫২)

## মুআশারাত

**১০. প্রশ্ন: (ক)** কোনো মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও হাদিয়া (খাবার বা ব্যবহারের জিনিস) পাঠালে প্রাপকের জন্য ঐ হাদিয়া গ্রহণের শরয়ী হুকুম কি?

**(খ)** উক্ত হাদিয়া স্বামীর অনুমতি ছাড়া প্রেরিত কিনা তা নিশ্চিত না হলে তার শরয়ী হুকুম কি?

**(গ)** আর স্বামীর অনুমতি ছাড়া প্রেরণের প্রবল ধারণা হলে তখন তার হুকুম কি?

**উত্তর:** স্বামীর সম্পদ ব্যবহার বা খরচ করার জন্য তার মৌখিক অনুমতি আবশ্যক নয়। বরং দেশীয় রীতি অনুযায়ী মহিলারা স্বামীর সম্পদ যেভাবে ব্যবহার করে থাকেন সেভাবে ব্যবহার করাও জায়েয আছে। যেমন, স্ত্রী অল্প-স্বল্প দান খয়রাত করলে তার স্বামী তাতে আপত্তি করে না। বা বাধা দেয় না। যা শরীয়তে স্বামী কর্তৃক এক ধরনের অনুমতি ধরা হয়ে থাকে। তাই তারা কাউকে কিছু হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা যাবে। যদি কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় যে, এ বস্তু দেয়ার ব্যাপারে হয়তো উক্ত মহিলার স্বামীর সম্মতি নেই, তাহলে এ ধরণের জিনিস নেয়া থেকে বিরত থাকা চাই। আর প্রবল ধারণা হওয়ার ক্ষেত্রে নেয়া যাবে না। যেসব ব্যাপারে অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা থেকে বিরত থাকা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশও বটে।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غبر مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجرها بما كسب... صحيح البخارى١٤٢٥

(সহীহ বুখারী: ১৪২৫, রদ্দুল মুহতার: ৫/৬৮৭, ৬৯৩, তানযীমুল আশতাত: ২/৩৪)

## বিবিধ

**১১. প্রশ্ন:** খানা খাওয়ার সময় টিভিতে ইসলামী কোনো অনুষ্ঠান দেখা যাবে কিনা?

**উত্তর:** খানা খাওয়া অবস্থায় কেন কোনো অবস্থাতেই বর্তমান টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠান দেখা জায়িয হবে না। যে টেলিভিশনের মধ্যে সর্বক্ষণ চরম বেহায়পনাসহ হারাম প্রোগ্রাম চলতে থাকে, তার মধ্যে সামান্য সময় ইসলামী প্রোগ্রাম (তাও আবার পূর্ব থেকে রেকর্ডকৃত যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত এবং কখনো চেহারা খোলা মহিলার দ্বারা) দেখানো এবং সেটা দেখা দীন নিয়ে ঠাট্টা তামাশার শামিল। এর দৃষ্টান্ত নাচ-গানের আসরের ফাঁকে ফাঁকে দীনের নসীহত করার মতই। যা কখনোই শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং টেলিভিশনে ইসলামী অনৈসলামী কোনো প্রোগ্রামই খাওয়ার সময় বা অবসর সময় দেখা জায়েয নেই। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৪/১৬৪, আহসানুল ফাতাওয়া: ৮/৩০৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/২৫৮, জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৪৫৩)

**১২. প্রশ্ন:** দীনী প্রয়োজনে মহিলারা তাবলীগের বড় পর্যায়ের সাথী বা মুফতী সাহেবগণের কাছে চিঠি লিখে নিজের সমস্যার সমাধান নিতে পারবে কিনা?

**উত্তর:** ফেতনার আশংকা না থাকলে, পর্দারক্ষা করে দীন বা দুনিয়াবী যেকোনো প্রয়োজনে একজন বেগানা মহিলা আরেকজন বেগানা পুরুষের সাথে সাদামাটাভাবে কথা বলতে পারে। তেমনি চিঠির মাধ্যমেও নিজের প্রয়োজনের কথা জানাতে পারে।

তাই মুফতী সাহেবের নিকট নিজের সমস্যা লিখিতভাবে ও পর্দার আড়াল থেকে মৌখিকভাবে জানিয়ে সমাধান নেয়া জায়েয আছে। কিন্তু মুফতী নয় এমন লোকের নিকট দীনী সমস্যার সমাধান চাওয়া ঠিক নয়। চাই সে যেকেউ হোক না কেন। কারণ, প্রত্যেক কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন লোক ঠিক করেছেন। একজনের কাজ আরেক জনের সাজে না। তাই তাবলীগী সাথীর কাছে লিখিতভাবেও ফাতওয়া জানতে চাওয়া ঠিক হবে না। উল্লেখ্য, কোনো পরপুরুষের সাথে দীনী প্রয়োজনে কথা বলতে হলে, নিজের কোনো মাহরামকে সাথে রাখা ভালো। আর লিখিতভাবে জানতে চাইলে, চিঠিতে মাহরামের স্বাক্ষর নিয়ে তারপর পাঠানো উচিত। এতে ফেতনার কোনো আশংকা থাকে না। (সহীহ বুখারী: ১/৪৪-৪৫, রদ্দুল মুহতার: ১/৪০৬, ৯/৫৩, আহসানুল ফাতাওয়া: ৮/৪০)

**১৩. প্রশ্ন:** আমি একজন মহিলা। আমাদের পাশের বাসায় হিন্দু পরিবার থাকে। তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করলে কি গুনাহ হবে? তাদের সাথে কি খারাপ ব্যবহার করা দরকার?

**উত্তর:** হিন্দু পুরুষদের সাথেও দেখা দেয়া জায়েয নেই। আর তাদের মহিলাদের সাথে দেখা দেয়াতে যদি কোনো প্রকার দীনী ক্ষতির আশংকা না থাকে তাহলে তাদের মহিলাদের সাথে দেখা দেয়া যাবে। আর যদি কোনো প্রকার ফেতনার আশংকা থাকে তাহলে তাদের মহিলাদের সাথেও দেখা দেয়া যাবে না। তেমনিভাবে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের দ্বারা যদি তাদের কৃষ্টি-কালচার বা তাদের প্রথা ভালো লাগার সম্ভাবনা থাকে তাহলেও তাদের সাথে দেখা দেয়া যাবে না।

আর সর্বাবস্থায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিবেশি হিসেবে অন্যান্য মুসলামানের যেসব পার্থিব হক আদায় করা হয় এবং তাদের সাথে যেমন ভালো ব্যবহার করা হয়, হিন্দু প্রতিবেশির সাথেও তেমন

ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং সহাবস্থানের হক আদায় করতে হবে।

قال النبى صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد... فاما الذى له حق واحد فجار مشرك لارحم له له حق الجوار... حلية الاولياء:٥/٢٠٧

(সহীহ মুসলিম হা.নং ৩৩, আলআদাবুল মুফরাদ হা.নং ১০৩, মুআত্তা মুহাম্মাদ হা.নং ৯৩৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৫/২০৭)

**১৪. প্রশ্ন:** গাঁজা ও ফেনসিডিল খাওয়ার হুকুম কি? কেউ কেউ বলে, গাঁজা যেহেতু গাছের পাতা, তাই গাঁজা খাওয়া হারাম হবে না। তাদের এ কথা কতটুকু সহীহ?

**উত্তর:** গাঁজা ও গাজাজাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদ জাতীয় নেশাজাত দ্রব্য নাপাক নয়। কিন্তু নেশা করার উদ্দেশ্যে অতিসামান্যও সেবন করা জায়িয নেই। নেশার উদ্দেশ্য ছাড়া চিকিৎসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি সেবন করা হয়, তাহলে জায়িয আছে। আর নেশাজাতীয় পানীয় মাদক। নেশার উদ্দেশ্য ছাড়াও সামান্য পরিমাণও পান করা জায়িয নেই। কারণ, এ সব পান করা হারাম হওয়ার সাথে সাথে নাপাকও বটে। তাছাড়া এগুলি দেমাগকে নষ্ট করে মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়।

'গাঁজা গাছ থেকে সৃষ্টি তাই গাঁজার নেশা হারাম হবে না' এ কথা বলা ঠিক নয়। অন্যান্য মদও গাছের ফল তথা আঙ্গুর, খেজুর, গম ইত্যাদি থেকে তৈরি হয়। তাই বলে কি সেসব মদ খাওয়া বৈধ হয়ে যাবে?

(সহীহ বুখারী: হা.নং ৫২, রদ্দুল মুহতার (রশীদিয়া): ৬/৬৭, আল বাহরুর রায়েক (শামেলা): ৯/১৪৭, আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ (শামেলা): ৫/৫৮৯)

**১৫. প্রশ্ন:** বর্তমান শেয়ার বাজার সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কি? হুকুমসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর:** ১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (অর্থ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দিয়েছি। (সূরা বাকারা: ১৭২)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (অর্থ) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন সম্পদ উপার্জনে কোন তোয়াক্কা করবে না যে, সে হালাল উপার্জন করছে, না হারাম উপার্জন করছে। (সহীহ বুখারী: হা.নং ২০৫১)

৩. অন্যত্র ইরশাদ করেন, (অর্থ) হারাম খাদ্যে লালিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বাইহাকী: হা.নং ৫৭৫৯)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, (অর্থ) হালাল ও হারামের বিষয় তো স্পষ্ট। তবে এ দু'য়ের মাঝে কতিপয় সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে, যেগুলো সর্ম্পকে বহু লোক অনবহিত। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকে সে নিজ দীন ও মর্যাদার হেফাযত করতে পারে। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয় সে পর্যায়ক্রমে হারামে পতিত হয়। (সহীহ বুখারী: হা.নং ২০৫১, সহীহ মুসলিম: হা.নং ১৫৯৯)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রুযী-রোযগার হালাল হওয়া আবশ্যক। স্পষ্ট হারাম থেকে বাঁচা যেমন জরুরী তেমনি শরয়ী প্রমাণের ভিত্তিতে হারামের সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকা জরুরী।

যারা কুরআন-হাদীস ও পরকাল বিশ্বাস করে না, দুনিয়ার জীবনে হয়তো তারা হারাম বা সন্দেহযুক্ত রুযী-রোযগার বর্জনের কষ্টটুকু স্বীকার করবে না। কিন্তু কোনো মুসলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রাচুর্যের লোভে চিরস্থায়ী আখেরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে না; বরং অসীম জীবনের সুখ-সাফল্যের লক্ষ্যে সীমিত সময়কে পূর্ণ সংযমের সাথে অতিবাহিত করতে সচেষ্ট হবে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় আয়-উপার্জনেও হারাম তো বটেই সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও থাকবে নিরাপদ দূরত্বে। বর্তমান যামানায় আয়-উপার্জনের একটি মাধ্যম হল শেয়ার বেচা-কেনা। অথচ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে রয়েছে হারাম ও নাজায়িয হওয়ার অনেক কারণ। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

**শেয়ারের শরয়ী বিশে- ষণ**

বর্তমানে শেয়ারসমূহের রয়েছে দ্বিমুখী সংশি- ষ্টতা–

(ক) কোম্পানীর সাথে সংশি- ষ্টতা ও (খ) শেয়ারবাজার বা পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা।

কোম্পানী বার্ষিক যে লভ্যাংশ ঘোষণা করে তা শেয়ার হোল্ডারের একাউন্টে জমা হয়ে যায়, তেমনি কোম্পানী যদি লভ্যাংশের পরিবর্তে বোনাস শেয়ার প্রদান করে তাও শেয়ারধারীর বি.ও তে জমা হয়, কিংবা রাইট শেয়ার নিতে চাইলে সে-ই প্রাধান্য পায়। আর ভবিষ্যতে কখনো কোম্পানী বিলুপ্ত হলে শেয়ার হোল্ডারগণ শেয়ার অনুপাতে সকল সম্পদে অংশীদার হয়। এ সকল বিষয়ের বিবেচনায় প্রতিটি শেয়ার মানে কোম্পানীর সকল সম্পদে আনুপাতিক অংশীদারিত্ব।

পক্ষান্তরে বর্তমান শেয়ারবাজারের শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। এখানে শেয়ারের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হয়। দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গ্রাহকদের চাহিদা বা অনীহা– এসব বিষয়ের প্রভাব শেয়ারের ক্ষেত্রে এক রকম, আর কোম্পানীর ক্ষেত্রে আরেক রকম। কোম্পানীর লাভ-লোকসানের সাথে শেয়ার-মূল্যের উত্থান বা পতনের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। শেয়ারবাজারে যারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের অধিকাংশের ধারণায়ও একথা থাকে না যে, সে কোম্পানীর আনুপাতিক অংশের ক্রয়-বিক্রয় করছে। এ সকল দিক বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারের বাস্তবতা হল– শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

**শেয়ারের মূল্য**

শেয়ারের মূল্য তিন ধরনের হয়ে থাকে,

(ক) গায়ের দর (Face value)।
অর্থাৎ শেয়ারের প্রথম নির্ধারিত মূল্য।

(খ) বাজার দর (Market value)।
অর্থাৎ শেয়ারবাজারে যে দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

(গ) বাস্তব দর (Neet asset value/Break up value)। অর্থাৎ কোম্পানী বিলুপ্ত হলে প্রতি শেয়ার হোল্ডার যা পাবে।

**শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান**

(ক) শরীয়তমতে কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হতে হলে তা মাল তথা সম্পদ হওয়া আবশ্যক। আর মাল বা সম্পদ বলা হয়, যা ব্যবহারযোগ্য এবং যার নিজস্ব মূল্য আছে। (ফিকহী মাকালাত: ১ম খন্ড, বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা: ১ম খন্ড)

একথা অনস্বীকার্য যে, শরয়ী সংজ্ঞা মতে শেয়ার সার্টিফিকেট, মাল নয়। বরং মাল হল কোম্পানীস্থিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক অংশ। কাজেই শেয়ার কেবল তখনই বেচা-কেনার যোগ্য হবে, যখন তা কোম্পানীস্থিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে।

যদি কোম্পানীর অর্থ-সম্পদের সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এসে যায় তখন শরয়ী দৃষ্টিতে তা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য থাকে না।

(খ) ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল হারাম কিংবা হারামযুক্ত না হওয়া। কাজেই কোন কোম্পানীর মূল কারবার যদি হারাম হয় যেমন, মদ বা মাদক জাতীয় বস্তুর উৎপাদন বা ব্যবসা, অনুরূপ প্রচলিত ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি, যাদের মূল কারবার হয় সুদের উপর অর্থ লগ্নি করা এ ধরণের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তমতে বৈধ নয়।

(গ) গায়ের দরের চেয়ে কম-বেশিতে শেয়ার লেন-দেন করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল কোম্পানীর 'স্থির সম্পদ' (Fixed asstes) থাকা। কাজেই যে সকল কোম্পানী 'স্থির' পণ্যের মালিক হয়নি সেগুলোর শেয়ার গায়ের দরের চেয়ে কম-বেশিতে লেনদেন শরীয়ত মতে জায়িয নয়।

(ঘ) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফটকাবাজী, প্রতারণা ও জুয়ামুক্ত হওয়াও জরুরী। অন্যথায় এর দ্বারা যে আয় হবে তা হালাল হবে না।

মোটকথা, সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা-নির্ভর, স্থির সম্পদ-সমৃদ্ধ, ফটকাবাজী ও জুয়া মুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া এবং পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয আছে।

**সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের হুকুম**

আজকাল একশত ভাগ হালাল কারবার করে, প্রাসঙ্গিক পর্যায়েও হারাম ও নাজায়িয লেনদেন করে না, এমন কোম্পানীর অস্তিত্ব না থাকার মতই। বিশেষ করে ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ নেওয়া ও ব্যাংক থেকে সুদী লোন নিয়ে ব্যবসায় লাগানোর কাজটি প্রায় সব কোম্পানীই করে থাকে। প্রশ্ন হল, এ জাতীয় কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া জায়িয আছে কি না?

ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ কিছু সংখ্যক আলিমের মতে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এ জাতীয় কোম্পানীর শেয়ার কেনা জায়িয হতে পারে। শর্তগুলো হলো-

(ক) কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) কিংবা যে কোনো উপায়ে নীতি-নির্ধারকদের নিকটে একজন শেয়ার হোল্ডার হিসেবে সুদী লেনদেনের বিপক্ষে প্রতিবাদ পাঠাবে। তার প্রতিবাদ কার্যকর না হলেও যেহেতু সে নীতিনির্ধারক বা পরিচালক নয়, কাজেই এ প্রতিবাদের পর সুদী লেনদেনের দায় তার উপর বর্তাবে না।

(খ) যদি কোম্পানী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ তার শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টিত লভ্যাংশের মধ্যে শামিল করে তাহলে কোম্পানীর 'ব্যালেন্সশীট' তথা আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখে সুদের আনুপাতিক অংশটুকু সাওয়াবের নিয়ত না করে সদকা করে দিবে।

(গ) যারা লভ্যাংশের জন্য নয়; বরং শেয়ার দিয়ে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে কিংবা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্রোকারী করে, তারাও আয়ের একটা অংশ অনুমান করে সদকা করে দিবে।

পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশ্বের অধিকাংশ আলিমের মত হল, সুদের মতো জঘন্য পাপের ক্ষুদ্রতম দায় বর্তায় এমন কাজও বিনা ঠেকায় কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। কাজেই মূল ব্যবসা হালাল হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী লেন-দেন করে এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। প্রতিবাদ করলে কোন কাজ হবে না– জেনেও স্বেচ্ছায় তাতে অংশীদার হওয়া, অতঃপর এ ঠুনকো প্রতিবাদ করা– তাতে সুদের দায় এড়ানো যাবে না। কোম্পানীর সুদী লোনের পরিমাণ কম-বেশি হওয়া– এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। অনুরূপ এ জাতীয় কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়াকে এ জাতীয় কোম্পানীর পণ্য ক্রয় করার সাথে তুলনা করাও ঠিক হবে না। সুদী লেন-দেনের বর্তমান ব্যাপকতাও এক্ষেত্রে অজুহাত হতে পারে না, যেমন বর্তমানে সুদের মারাত্মক ব্যাপকতা সত্ত্বেও সুদের কোন অংশ বৈধ নয়।

**বর্তমান শেয়ারবাজারের শরয়ী বিধান**

বর্তমান শেয়ারবাজার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, Capital Gain তথা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা (যদিও কখনো লোকসানও গুনতে হয়), কোম্পানীতে অংশীদার হয়ে লভ্যাংশ (Dividend) গ্রহণ মূল উদ্দেশ্য নয়; যদিও কখনো দাম বাড়ার অপেক্ষা করতে হয়। এ বাজারকে Secondary market (সেকেন্ডারী মার্কেট), Money market (মানি মার্কেট), Capital market (ক্যাপিটাল মার্কেট)-ও বলা হয়। এ বাজারে শেয়ারের লেন-দেন হয় স্বতন্ত্র গতিতে। কোম্পানী ঘোষিত 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু' তথা শেয়ারের বাস্তব মূল্যের সাথে এবং কোম্পানীর বাস্তব অবস্থার সাথে শেয়ারবাজারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক একেবারে গৌণ।

এ বাজারের শেয়ার আর কোম্পানীতে আনুপাতিক অংশিদারিত্ব মোটেও এক জিনিষ নয়। অথচ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার মূল ভিত্তিই ছিল এ কথার উপর যে, শেয়ার মূলত কোম্পানীর সকল সম্পদের আনুপাতিক মালিকানা। শুধু কাগজ বা সংখ্যা হলে তার ব্যবসা জায়িয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা তখন সে ব্যবসার অর্থ হবে টাকার বিনিময়ে টাকার ব্যবসা। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ফিকাহবিদের মতে প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী কারবারে জড়িত কোম্পানীসমূহের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হওয়ার জন্য সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে শর্ত রাখা হয়েছে, শেয়ার ব্যবসায়ীদের জন্য সে শর্তটি পালন করাও সম্ভব নয়। কারণ, তারা কখনো দিনেই কয়েকবার বেচাকেনা করে আবার একসঙ্গে বহু কোম্পানীর শেয়ার লেন-দেন করে। এ অবস্থায় তারা কতবার সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে? কার কাছেই বা প্রতিবাদ করবে? আর যদি প্রতিবাদ করেও, তা কি হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না?

সুতরাং বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় (Capital Gain) করে অর্থোপার্জন এক ধরণের জুয়া, যা কোন সূরতেই জায়িযের আওতায় পড়ে না এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে শেয়ার-ব্যবসা করাকে কোন নির্ভরযোগ্য আলিম বৈধ বলেছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

**যারা শেয়ার-ব্যবসার সাথে জড়িত নির্ধারিত তাদের করণীয়**

শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে অবগত না হয়ে লাখ লাখ মুসলমান এমনকি অনেক দীনদার লোকেরাও এ যাবত এ ব্যবসায় জড়িত হয়েছেন এবং অনেকেই এ ফটকাবাজী ব্যবসার স্বাভাবিক পরিণতিও বরণ করেছেন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ ভবিষ্যতে কখনো এ ব্যবসা না করার সংকল্প করেছেন। কারো কারো কিছু শেয়ার অবশিষ্টও রয়ে গেছে। এদের ক্ষেত্রে শরয়ী হুকুম কী?

এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। একজন লোক বিপদে জড়িয়ে পড়ার পর তা থেকে

মুক্ত হতে চায়, আরেকজন ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় সেই বিপদে জড়াতে চায়। দু'জনের হুকুমে ক্ষেত্রবিশেষে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা। কাজেই কারো জন্য নতুন করে এ ব্যবসা শুরু করা বা পুরাতন ব্যবসায়ীর জন্য এতে জুড়ে থাকা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তো নির্ধারিত। সুদের অংশ সদকা করবেন এ নিয়তেও তাদের জন্য এ ব্যবসায় প্রবেশ করা জায়িয হবে না। কিন্তু যারা হালাল পণ্য উৎপাদনকারী বা বৈধ পণ্যের ব্যবসা করে এমন কোম্পানীর প্রাইমারী বা সেকেন্ডারী শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে ইতিপূর্বে আয় করেছেন, তারা সংশি ষ্ট কোম্পানীসমূহের বিগত দিনের 'ব্যালেন্সশীট' দেখে নিবেন। ব্যালেন্সশীটে আয়ের মধ্যে যদি সুদের অংশ উল্লেখ থাকে তাহলে সে অংশ অনুপাতে, বরং সতর্কতামূলক কিছু বেশি টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবেন। অনুরূপভাবে শেয়ারবাজার যখন জুয়াড়িদের ষড়যন্ত্র, বা 'মার্চেন্ট ব্যাংক' সমূহের অতিমাত্রিক লোনের প্রভাবে কৃত্রিমতায় ভাসছিল, তখন যারা রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তারাও কোম্পানীর বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনা করে অস্বাভাবিক আয়টুকু সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবেন।

আর যাদের নিকট এখনো কোন কোম্পানীর শেয়ার বিদ্যমান আছে তারা তাদের শেয়ারের বাজার-মূল্য কোম্পানীর 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু'র সমপরিমাণ হলেই বিক্রয় করে এ ব্যবসা থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়বেন। এতে যদি আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে পরকালের দিকে চেয়ে সেই ক্ষতি মেনে নিবেন।

আর যারা ব্যাংক-বীমা ও হারাম কারবারে জড়িত কোম্পানীর শেয়ার দ্বারা ব্যবসা করেছেন, তাদের তো সম্পূর্ণ আয়ই সদকা করে দেওয়া জরুরী। একসাথে সম্ভব না হলে আস্তে আস্তে সদকা করতে থাকবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি মনে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে নিজ অপার কৃপায় ক্ষমা করুন। আমীন।

# রাবেতা সংবাদ

**রাবেতার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত**
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার উদ্যোগে গত ২২শে জুন ২০১৩ খ্রি. রোজ শনিবার জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ার মিলনায়তনে রাবেতার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে সারা দেশ থেকে রাহমানিয়ার ফুযালায়ে কেরামের ঢল নেমেছিল। দীর্ঘদিন পর পিতৃতুল্য আসাতিযাগণের সান্নিধ্য পেয়ে তাদের হৃদয় ছিল আবেগাপ্লুত। চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। আসাতিযা হযরাতও রূহানী সন্তানদেরকে কাছে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলেন।

সম্মেলনে যোগ দিতে একদিন আগে থেকেই ফুযালাগণ জামি'আয় উপস্থিত হতে থাকেন। ২২ তারিখ সকাল ৯টায় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আগত ফুযালাদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন রাবেতার মুহতারাম আমীর হযরত আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ দা.বা.। স্বাগত ভাষণের পর জামি'আর সুযোগ্য মুহতামিম হযরতুল আল্লাম হিফযুর রহমান মুমিনপুরী (দা.বা.) এক দীর্ঘ বয়ানে দীনী স্বার্থে ফুযালায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হযরতের বয়ানের পর 'তালিবে ইলমদের তা'লীম-তরবিয়াতের পদ্ধতি ও উস্তাদ-শাগরিদের সম্পর্ক' শীর্ষক সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন জামি'আর নায়েবে মুহতামিম হযরত মাওলানা ইবরাহীম হেলাল সাহেব (দা.বা.)।

অতঃপর আলোকচিত্রের সাহায্যে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া গঠনের প্রেক্ষাপট, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন হযরত মাওলানা শফীকুর রহমান সাহেব।

তারপর ফুযালাগণ জামা'আত ভিত্তিক পৃথক পৃথক মজলিসে পরস্পরে সাক্ষাত ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় রাবেতার 'সদস্য ও মতামত ফরম' পূরণ করা হয় এবং সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'আর রাবেতা' বিতরণ করা হয়। দীর্ঘদিন পর পুরনো সাথীদের সাথে সাক্ষাতে মজলিসে তখন এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সাক্ষাৎ-পর্ব শেষে বিগত ১৩ বছরের প্রত্যেক বর্ষ হতে একজন করে ফাযেল রাবেতা গঠন প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করেন এবং রাবেতার সঙ্গী হয়ে এর উন্নতিকল্পে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ততক্ষণে যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ায় নামায ও আপ্যায়ন-বিরতী ঘোষণা করা হয়।

বা'দ যোহর বর্তমান পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন জামি'আর শাইখুল হাদীস, মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.।

হযরতের বয়ানের পর জামি'আর নায়েবে মুফতী মুহতারাম সাঈদ আহমদ সাহেব দা.বা. 'বাতিল প্রতিরোধেও ভারসাম্যতা থাকতে হবে' শীর্ষক আলোচনা পেশ করেন। গুরুত্ব বিবেচনায় হযরতের আলোচনাটি রাবেতার চলমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তারপর রাবেতার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-বিবরণী, সারাদিনের আলোচনা-সারাংশ ও কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। অতঃপর হযরত মুফতী সাহেব হুযুরের দু'আর মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনে প্রতিবর্ষ হতে তিনজন করে ফুযালাকে জামা'আত-প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয় এবং নির্বাচিত জামা'আত-প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আসাতিযা হযরাতের তত্ত্বাবধানে রাবেতার পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়।

**স্মারকগ্রন্থ 'আর-রাবেতা' প্রকাশিত**
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে 'আর-রাবেতা' নামে একটি মানসম্মত স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্মারকটি জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার বিগত ১৩ বছরের ফুযালায়ে কেরামের নাম, তাদের স্থায়ী, অস্থায়ী, কর্মস্থল ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত ঠিকানা ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ। ইতোমধ্যে ঢাকার অধিকাংশ মাদরাসায় এবং সারা দেশের প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলোতে স্মারকটি হাদিয়া স্বরূপ বিতরণ করা হয়েছে।

**বিভিন্ন পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত**
গঠিত পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ রাবেতার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে ১৫টি পরামর্শসভার আয়োজন করেছে। তাদের মেহনত ও দৌড়-ঝাঁপেই রাবেতার পত্রিকা প্রকাশ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। উপস্থিতির সুবিধার্থে জামি'আয় আয়োজিত দাওয়াতুল হকের মাসিক আইম্মায়ে মাসাজিদ সম্মেলনকে রাবেতার পরিচালনা/সাধারণ পরিষদের নিয়মিত পরামর্শসভার দিন ধার্য করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত**
জানুয়ারী '১৪ থেকে রাবেতার উদ্যোগে 'রাবেতা' নামে ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

# সেমাহী পরীক্ষার পূর্বে বিরতী চলাকালীন টাঙ্গাইলের উলামায়ে কেরামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও কওমী মাদরাসাগুলোর খোঁজ-খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে আসাতিযায়ে কেরামসহ দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দাওয়াতী কাফেলা টাঙ্গাইল সফরের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে দেশের চলমান অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরামর্শক্রমে তা মওকূফ করা হয়।

# টাঙ্গাইল জেলার বিন্যাফৈর গ্রামে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্ররোচনা ও প্রলোভনে পড়ে কিছুদিন পূর্বে ৪৬ জন মুসলিম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। (নাঊযুবিল্লাহ) সংবাদ পেয়ে সরেজমিনে তদন্তের জন্য রাবেতা কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ফাযেলকে দায়িত্ব দেয়। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী টাঙ্গাইলের উলামায়ে কেরাম, তাবলীগী মারকাজ ও কিছু দীনদার ভাইয়ের মেহনতের উসিলায় বর্তমানে দু'টি পরিবার ব্যতীত সকলে তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছে। ফুযালায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শপূর্বক রাবেতা কর্তৃপক্ষ সেখানে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার মধ্যে মানসম্মত একটি নূরানী মক্তব প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

ফুযালায়ে কেরামকে নিজ নিজ এলাকায় ও কর্মস্থলের আশপাশে খ্রিস্টান মিশনারীদের যে কোন সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ও স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনকে যথাসাধ্য সজাগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে। যাতে দীন-ধর্ম ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের যে কোন পায়তারা শুরুতেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

প্রয়োজনে রাবেতার মুহতারাম আমীর ও দাওয়াতুল ইসলাম বিভাগের দায়িত্বশীলের সঙ্গে যথাক্রমে ০১৭১১১৪০৩৮৯ ও ০১৮১৪৩৫৮১৩৯ এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

# রাহমানিয়ার হালচাল

**নির্মাণ কাজ চলছে**

বাংলার ঐতিহ্যবাহী দীনী প্রতিষ্ঠান জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও নতুন পরিকল্পনা "জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসার জন্য মুহাম্মদপুর ভেড়ীবাঁধের পশ্চিম পার্শ্বে স্বপ্নধারা হাউজিং লি.-এ প্রায় ৭০ কাঠা (সাড়ে তিন বিঘা) নিজস্ব জায়গার ব্যবস্থা হয়েছে। ভরাট সহ জমি ক্রয় বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ছয় কোটি টাকা। ইতিমধ্যে সেখানে দু'টি স্টিলশেড ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এ বছর সেখানে হিফয ও উচ্চতর গবেষণা বিভাগসমূহের (ইফতা, হাদীস, তাফসীর) শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে (আল্হামদুলিল্লাহ)।

প্রায় ১২ কাঠা জায়গার উপর ৫তলা বিশিষ্ট 'মসজিদুল আবরার' -এর নির্মাণ কাজ চলছে। প্রথম ছাদের ঢালাইয়ের কাজও শেষ হয়েছে। অত্যাধুনিক ডিজাইনের ৫তলা মসজিদ ভবন নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় নিম্নরূপ:

**১.** ফাউন্ডেশন ব্যয়- ১,৪৮,০০,০০০/-
**২.** ফাউন্ডেশনসহ এক তলা পর্যন্ত ব্যয় হবে- ২,২০,০০,০০০/-
**৩.** ৫তলা পর্যন্ত ব্যয় হবে- ৭,২৮,০০,০০০/-
**৪.** মিনারের সম্ভাব্য ব্যয় (১৫তলা সমান উঁচু হবে)- ৫৩,৭৫,০০০/-

মিনারসহ মসজিদের সর্বমোট ব্যয় হবে- ৭,৮১,৭৫,০০০/- (সাত কোটি একাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা) অর্থাৎ প্রায় আট কোটি টাকা।

এছাড়াও দশতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট মাদরাসা ভবনের কাজও অতি দ্রুত শুরু করা হবে।

উল্লেখ্য, মসজিদ-মাদরাসার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার গায়েবী খাযানার উপর ভরসা করে এগিয়ে চলছে, অপর দিকে জমি ক্রয়ের ও নির্মাণ ফান্ডে এখনো প্রায় ৮৫,০০,০০০/- (পঁচাশি লক্ষ টাকা) ঋণ রয়ে গেছে। এদিকে মাদরাসার সীমানার মধ্যে অন্যের মালিকানাধীন দুই কাঠা জমি রয়ে গেছে, যার সম্ভাব্য মূল্য ৪০,০০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ টাকা)। এ জায়গাটি মাদরাসার জন্য ক্রয় করা আশু প্রয়োজন। কিন্তু ফান্ড না থাকায় তা সম্ভবপর হচ্ছে না। অথচ দিনদিন জায়গার মূল্য বেড়েই চলছে। অতএব জামি'আর সার্বিক উন্নতি অগ্রগতির জন্য সকলের নেক দু'আ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

**মুহাদ্দিসে জামি'আর কাতার ও আফ্রিকা সফর:**

জামি'আর প্রবীণ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দীন কাসেমী দা.বা. পাঁচ মাসের দাওয়াতী সফরে কাতার ও আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়ায় গিয়েছিলেন। এ সফরে তিনি কাতারের আমীরের পুত্র শাইখ ফাহাদ বিন হাম্মাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এছাড়াও কাতার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করে দীনী দাওয়াতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। হযরতের সফরকে কেন্দ্র করে কাতার কেন্দ্রীয় মারকাযে প্রবাসীদের খুসুসী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দীনী আলোচনা পেশ করেন।

মৌরিতানিয়ায় সফর কালেও তিনি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ও সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে মেহনত করে বিদেশ সফরের জন্য ২০টি, নিজ দেশে তিন চিল্লার জন্য ১২টি ও এক চিল্লার জন্য ১০টি জামা'আত উসূল করেন।

হযরতের বিদেশ সফরের মধ্য দিয়ে আসাতিযায়ে রাহমানিয়ার বিদেশ সফরের ধারা চালু হল। এ বছরও একজন উস্তাদ বিদেশ সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সফরকে আসান করুন এবং এই ধারা দায়েম রাখুন। আমীন ॥

দাওয়াতী মেহনতের যুগান্তকরী মাইল ফলক জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ব্যতিক্রমধর্মী উসূল; প্রতি বছর জামি'আর পক্ষ হতে একজন উস্তাদকে সালে পাঠানো হয়। সে সুবাদে আলহামদুলিল্লাহ জামি'আয় ১৪/১৫ জন সালওয়ালা উস্তাদ রয়েছেন। এ বছর সালে আছেন নাযেরা বিভাগের উস্তাদ হযরত মাওলানা ক্বারী জালালুদ্দীন সাহেব।

# ভালোবাসা নয়, মিছরির ছুরি

**মাহফুজ ইকবাল**

বাঁশের পাতলা চটিতে বোনা প্রমাণ-সাইজের চালুনী। উল্টো পিঠে সাদা রঙের জমিন। সীমানায় ইঞ্চি দেড়েকের নীল মোটা বৃত্ত। মাঝখানে গাঢ় লালে একটি হরফের নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি। সারবেঁধে দাঁড়ানো সমউচ্চতার একদল কিশোর। হাতে ভিন্ন ভিন্ন হরফের এক একটি চালুনী, বুক বরাবর তুলে ধরা। তাদের পেছনে পাঞ্জাবী-টুপির বিশাল মিছিল। কিশোরদের বুকগুলো সমবেত হয়ে চলছে ‘ জ শ নে জু লু সে ঈ দে মী লা দু ন ন বী ’। ঢাকার রাজপথে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় এ দৃশ্য দেখেনি এমন মানুষ বিরল। এটা প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়ালের সাধারণ চিত্র। দিনটি পালন করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ-আয়োজনও লক্ষ্য করা যায়। অনেক বছর আগেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ দিনটিকে সরকারী ছুটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সন্দেহ নেই এই সকল ব্যবস্থা ও আয়োজন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত ও ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। বলাবাহুল্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও ভক্তি নিবেদন ঈমানের অঙ্গ। সে হিসেবে নবী প্রেমিকের নবী-ভক্তিও অবশ্য-সম্মানীয়। তবে প্রেমাষ্পদের ভিন্নতায় যেমন ভালোবাসার সীমারেখায় পার্থক্য হয় তেমনি ভক্তি নিবেদনের পদ্ধতিতেও পার্থক্য হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর উম্মতের ভক্তি-ভালোবাসা অন্য আর দশটা ভালোবাসার মত নয়। এ ভালোবাসা তাঁর সম্মান, আযমত, বড়ত্ব হিসেবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও মুহসিনে উম্মত হওয়া হিসেবে। তাই এক্ষেত্রে ব্যবহৃত আচরণ ও উচ্চারণ সবকিছুই হতে হবে শালীনতার সর্বোচ্চ মানের। নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে যেনতেন কিছু করা কোন ভাবেই রাসূলের প্রতি প্রেম নিবেদনের পদ্ধতির অংশ হতে পারে না। এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না, যা শানে নবুওয়াতের পরিপন্থী।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

‘তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে আমি তার নিকট বেশী প্রিয় না হই।’

হযরত হুযাইফা (রা.)-এর বলিষ্ঠ উচ্চারণ,

ااترك سنة حبيبي صلي الله عليه وسلم لهؤلاء الحمقاء

‘আমি কি এসব নির্বোধদের কারণে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দিব!’

নবীজীর এ হাদীস ও সাহাবীর এ উক্তি থেকে নবী-প্রেমের দু'টি মূলনীতি বের হয়ে আসে-

১. পার্থিব জীবনের ভালবাসা অর্থাৎ পিতামাতা, সন্তানাদি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদরাজি এবং অন্যান্য বৈষয়িক বস্তুর প্রতি ভালবাসা অস্বাভাবিক নয়। কেননা এগুলো মানুষের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। তবে এগুলোর উপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রে যদি নবীজীর সাথে এগুলোর কোন একটির বিরোধ হয়ে যায়, তখন একজন মুমিনের দায়িত্ব হবে, একটি নয়; প্রয়োজনে সে সকলকে অসন্তুষ্ট করবে, কিন্তু নবীজীকে অসন্তুষ্ট করবে না। নবীজীর মর্জির খেলাফ কিছু করবে না। এটাই তার ঈমানের পরিচয়।

২. নবীজীর প্রতি প্রেম নিবেদন বিশেষত কোন আমল, সময় বা স্থানের সাথে নির্ধারিত নয়, প্রেমিক মানেই যখন প্রেমাষ্পদের জন্য উৎসর্গিত একটি ব্যাকুল হৃদয়, তখন প্রেমাষ্পদের যাবতীয় আমল ও হুকুম বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও সর্বদা অনুসরণ করবে এবং সানন্দে পালন করবে। চাই তা একটি ছেড়া রুটির টুকরো তুলে খাওয়ার ক্ষেত্রে হোক না কেন।

উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে বিবেচনা করলে নবীজীর প্রতি প্রেম নিবেদন আনুষ্ঠানিক কোন সীমারেখার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বলা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেম নিবেদনের যে অংশগুলো উপস্থাপন করা হয় তা একটি অনুষ্ঠানই মাত্র। আর যখন একটি বিষয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে যায় তখন তার উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়।

বছরের প্রতিটি দিনেই এবং প্রতিটি মুহূর্তেই একজন মুসলমান এমন কিছু বিষয়ের মুখোমুখি হয় যেগুলোর ক্ষেত্রে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে নবীজীকে সন্তুষ্ট করবে, সমাজের বৈরী পরিবেশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পথ ও পন্থা উপেক্ষিত, মানুষের শত ভর্ৎসনা ও তিরস্কার শুনেও যে পথ ও পন্থাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলে বা সাধ্যানুযায়ী সে চেষ্টা করলে তবেই তো বলা যাবে আমরা আমাদের রাসূলকে ভালবাসি।

সন্দেহ নেই, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমন মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। ইসলামে যদি কারো জন্মোৎসব পালনের বিধান থাকতো তাহলে নবীজীর জন্মোৎসব পালনই ছিল সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত এবং এ দিবসই সবচে' বড় আনন্দ-উৎসবের দিবস হিসেবে নির্ধারিত হতো। অথচ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তিনি দুনিয়াতে অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছরই রবিউল আউয়াল মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কখনো তিনি জন্মোৎসব পালন করেননি। তাঁর কোনো সাহাবীও এ ধরণের কোন কল্পনা করেননি।

মূলত ইসলাম রসম-রেওয়াজ পালনের ধর্ম নয়। ইসলাম হলো আমলের ধর্ম। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও পরকালীন ভাবনায় ব্যস্ত রাখে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা জীবনাদর্শ অনুশীলনের দীক্ষা দান করে।

রবিউল আউয়ালের এ মাসে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন- এ কথা যখন আমাদের স্মরণ হয় তখন নবী-প্রেমের দাবী ছিল, সারা বছর দীনের যে ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের ঘাটতি ও অবহেলা হয়েছে সে বিষয়গুলো আলোচনায় এনে তওবা করে নতুন উদ্যমে নতুন আগ্রহে অঙ্গীকার করার যে, এ বিষয়ে আর কখনো অবহেলা করবো না এবং দীনের কোন নীতিকে

লঙ্ঘন করবো না। নবীজীর জন্মের সময়টি স্মরণে আসলে সর্বপ্রথম এ কথা ভাবা উচিৎ যে, তাঁর জন্ম কেন হয়েছিল? কী ছিল তাঁর পয়গাম ও মিশন? এর জন্য তিনি কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছেন? আমাদের জীবনে তার শিক্ষা কতটুকু বাস্তবায়িত করছি? অথচ ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রচলিত রূপরেখায় এ ধরণের তো কোন কিছুর আভাসই পাওয়া যায় না! বরং প্রেম নিবেদনের এমন কিছু রীতি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা বন্ধ করার জন্য নবীজীর হাজারও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

আমরা দেখলাম, বিজাতিরা তাদের বড় বড় নেতাদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিবস পালন করে, উক্ত দিবসসমূহে বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ উৎসবের আয়োজন করে। তো তাদের দেখে আমরাও ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ-সভার জন্য ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করবো! কিন্তু আমরা মোটেও ভেবে দেখিনি যে, যাদের জন্য দিবস পালন করা হয়, তারা এবং আমাদের নবীজীর জীবন চরিতের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক ও পার্থক্য। এদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অনুসরণীয় হিসেবে আদৌ গণ্য করা যায় না। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছে সঠিক করেছে, তারা নিষ্পাপ ও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিল এ ধরণের দাবী তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; বরং তারা হয়তো রাজনীতি বা অন্য কোন জাগতিক ক্ষেত্রে মানুষের নেতা ছিল। ফলে মানুষের স্মৃতি থেকে যেন হারিয়ে না যায়; মানুষের স্মৃতিতে জীবিত থাকে, তাই তাদের কেন্দ্র করে দিবস উদযাপন করা হয়।

কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্ব মানবতার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন। নবীজীর পবিত্র জীবনকে আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করেছেন। তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর জীবনাদর্শের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য নেতাদের সাথে কোনভাবেই তুলনা করতে পারি না। এ তুলনা আমাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে। বরং আমাদের জীবনের প্রতিটি দিবসই তাঁর চরিত্র-সীরাত আলোচনা ও অনুশীলন দিবস।

ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রথমে তো মাহফিল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন মাহফিল থেকে আরও অগ্রসর হয়ে জশনে জুলূস ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি পর্যন্ত বের করা শুরু হয়েছে। এখানেও সেই ঠুনকো যুক্তি দেখানো হয়, 'অমুক দল অমুক নেতার স্মরণে রবিউল আউয়াল মাসে আনন্দ মিছিল বের করে, আমরা কেন আমাদের নবীর স্মরণে রবিউল আউয়াল মাসে জশনে জুলূস বের করবো না?' এখানে আমাদের বিবেচনার দিক হলো, বিজাতিরা তাদের বড় ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে ধরণের পন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেমন খ্রিস্টানদের বড়দিন, হিন্দুদের পূজাসমূহের দিন, শিয়াদের তাযিয়া-মিছিল, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বর্ষবরণ উপলক্ষে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান ইত্যাদি উল্লেখিত অনুষ্ঠানগুলোর সাথে আমাদের জশনে জুলূসের সাদৃশ্য কতটুকু আর দূরত্ব কতটুকু? আরও বিবেচনার বিষয় হলো, সদৃশ দিকগুলোর ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, তা থেকে সহজেই এ অনুমান করা যায় যে, এ দূরত্বটা বেশী দিন বাকি থাকবে না।

বিধর্মীরা তাদের ধর্মটাকে নিজের হাতে সাজিয়েছে বিধায় কোন বাধা-বন্ধন দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করা যাবে না। যতভাবে মানসম্পন্ন করা যায় তার সবগুলোই এরা ধর্মের আবরণে ঢেকে ফেলতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের তো সে সুযোগ নেই। সব ক্ষেত্রে আমরা বিধর্মীদের সাথে পাল্লা দেব এবং শরীয়তের সীমারেখার ভিতর থেকেও এদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবো- এ আশা করা ভুল। ইসলাম এ ধরণের অহেতুক ও অযৌক্তিক কার্যকলাপ কখনই সমর্থন করে না। ইসলাম মানুষকে প্রান্তিকতামুক্ত সত্য, সরল, সুন্দর জীবনের শিক্ষা দান করে। তাই ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে শেখা রসম ও প্রথা তাদের দেয়া পদ্ধতিতে পালন করে আমরা উভয় জগতের কামিয়াবী কতোটা হাসিল করতে পারবো এবং আশেকে রাসূলের দাবীদার হিসেবে রাসূলের কতটুকু নিকটবর্তী হতে পারবো? তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।